প্রকাশক :
শ্রী কুনালকুমার রায়
নাভানা
পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬১

মুদ্রক :
শ্রী বিকাশ হাজরা
বিষ্ণু প্রিন্টিং হাউস
৩৮/১এ হরীতকী বাগান লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রী সমীর ঘোষ

মুখবন্ধ

এই প্রবন্ধগুলি সম্প্রতি লেখা। এদের ভিতরে দুটি প্রবন্ধ 'দেশ' পত্রিকায় এবং অন্য দুটি প্রবন্ধ 'জিজ্ঞাসা' ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি বইয়ের আকারে আগে কোথাও গ্রথিত বা সংকলিত হয় নি। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে কিছুটা ঘষামাজা করেছি, কিছু বাদ দিয়েছি, কিছু যোগ করেছি।

পাঠক-পাঠিকাদের ভিতরে অনেকে আমার শব্দনির্মাণ ও শব্দপ্রয়োগ সম্পর্কে অভিযোগ করেন। আমার ব্যবহৃত কিছু শব্দ তাঁদের অপরিচিত, ফলে পড়তে অসুবিধা হয়। অভিযোগ করবার অধিকার পাঠক-পাঠিকাদের অবশ্যই আছে। আমার দিক থেকে দু'একটি কথা নিবেদন করি। আমরা সচরাচর মুখের কথায়, চিঠিপত্রে, খবরের কাগজে, গল্প-নাটক-উপন্যাসে যেসব শব্দ ব্যবহার করি তার বাইরেও বাংলাভাষায় বিস্তর শব্দ আছে, আর আছে শব্দ তৈরি করবার সম্ভাবনা। তাত্ত্বিকবিষয় নিয়ে ভাবনার ভাষা আর আড্ডার ভাষায় কিছুটা পার্থক্য থাকে। তাছাড়া অধিকাংশ ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালি আলাপ-আলোচনায় যেখানে সেখানে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। আমি দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে আসছি বাংলাভাষায় তাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রতিষ্ঠা দিতে এবং কী মুখের ভাষায়, কী লেখার ভাষায়, যতদূর আমার সাধ্য বাংলার সঙ্গে ইংরেজী শব্দ না মেশাতে। যেসব সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসি শব্দ বাংলাভাষায় আগে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এখনকার অলস লেখক/পাঠক যে-গুলির সঙ্গে ততটা পরিচিত নন, প্রয়োজনমতো তেমন কিছু শব্দ কাজে লাগিয়েছি। কখনো কখনো কিছু শব্দ নির্মাণ করেছি প্রয়োগের দ্বারাই যাদের অর্থ ক্রমে স্পষ্টতর হবে। আমার যদি নিজস্ব কিছু বক্তব্য থাকে আমার নিজের ধাঁচেই সেটি বলা সংগত। পাঠক-পাঠিকা না হয় একটু পরিশ্রম করলেন, এই ধরনের পরিশ্রম মনের মেদ ঝরানোয় সাহায্য করতে পারে।

আমার লেখা সময় কাটানোর অথবা ঘুমোবার আগে শুয়ে শুয়ে পড়বার উপযোগী নয়। বরং সিধে হয়ে বসে পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ভাববার জন্য একটু পায়চারি করে নিলে আমার বক্তব্য আর-একটু স্পষ্টতর ঠেকতে পারে। তারপর যদি আমার যুক্তি অগ্রহণীয় ঠেকে আমার দিক থেকে সেটি জানা জরুরী। কারণ সুচিন্তিত সমালোচনার দ্বারা উপকৃত হতে আমি আগ্রহী।

বাংলা ভাষায় দায়িত্বশীল সমালোচনা দুর্লভ, ভাবুকের সঙ্গে ভাবুকের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত বিতর্ক আরো দুর্লক্ষ্য। বই না পড়েই অথবা বইয়ের বক্তব্য না বুঝেই যাঁরা সমালোচনা লেখেন (তা সে বন্ধু হিসেবেই হোক,

শত্রু হিসেবেই হোক, অথবা মাতব্বরীর উদ্দেশ্যেই হোক), তাঁরা বাংলা সাহিত্যের বিস্তর ক্ষতি করেছেন। আমার ভরসা সেই পাঠক ও পাঠিকাদের উপরে যাঁরা জিজ্ঞাসু, যাঁরা ভাবনাচিন্তায় আগ্রহী, যাঁরা নিজেরাও কিছুটা মানসিক পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। তাঁদের কথা ভেবেই লিখি, যদিচ প্রকাশক কাঁদের ভরসায় আমার বই ছাপেন তা আমি জানি না।

বাঁভানা-র শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায় নিজে উদ্যোগী হয়ে এই বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। বিস্তর কাটাকুটি করা আমার পাণ্ডুলিপি থেকে ছাপাখানার জন্য পরিচ্ছন্ন কপি করে দিয়েছেন কুমারী বর্ণালী দাস। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সূচিপত্র

জিজ্ঞাসা ও বিবেকিতা
সুবেদিতা ও উদ্ভাবনা
স্বনির্ভরতা ও সহযোগ
সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনতাকে

আবার যাঁরা
নিজেদের জীবনে ও সমাজসংস্কৃতিতে
উজ্জীবিত করবেন

তাঁদের উদ্দেশে—

নাস্তিকের ধর্মজিজ্ঞাসা

আমি আকৈশোর নাস্তিক। ঠিক কখন নাস্তিক্য আমার চেতনায় আকার পায় বলা শক্ত, কিন্তু স্মৃতির সড়ক ধরে যত পিছনেই যাই না কেন এমন কোন কাল আমার নজরে আসে না যখন ঈশ্বর, দেবদেবী, আত্মা, প্রেত, পরকাল ইত্যাদি, কিংবা মানুষীকল্পনাজাত নয় এমন কোন অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বে আমার আস্থা ছিল, অথবা পূজাপ্রকরণে আমার অনীহা গভীর ছিল না। এবং যদিও বহু শুভানুধ্যায়ীর মুখে বারবার শুনেছি যে রক্ত শীতল হয়ে এলে তুরীয়ের প্রয়োজন (এবং ভাগ্যে থাকলে, উপলব্ধি) নাকি আপনি ঘটবে, শাস্ত্রনির্দিষ্ট বানপ্রস্থের কোঠায় বেশ কয়েক বছর আগে পা দেবার পরও অদ্যাবধি আমার লোকায়ত প্রতিন্যাসে শৈথিল্য ঘটে নি। এমনকি অজ্ঞাবাদের বিদগ্ধ প্রলোভনও আমাকে কিঞ্চিন্মাত্র আকৃষ্ট করে না।

অথচ যে-পরিবারে আমি জন্মেছি এবং যে-পরিবেশে আমার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের অন্তত কিছুটা অংশ কেটেছে, সেখানে ধর্মবিশ্বাসে অভ্যস্ত হওয়া আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল। মা ছিলেন খাস কলকেতিয়া মেয়ে ; ইহকাল এবং পরকালের দাবির মধ্যে সুস্থিতি রচনায় তাঁর ছিল সহজ নৈপুণ্য ; সংসারকে তিনি বশ করেছিলেন রান্নাঘর এবং নিরলস সেবার সূত্রে ; আর তাঁর ঠাকুরঘরে ছিল বেসুমার হিন্দু দেবদেবীর রাজত্ব। বিরাট পরিবার এবং আত্মীয় অভ্যাগতদের বিচিত্র দাবি-দাওয়া মিটিয়ে যেটুকু বাড়তি সময় তাঁর মিলত তা ছিল ব্রতপার্বণ, উপবাস অনুষ্ঠানে ঠাসা। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের ভিন্ন রূপও আমার একেবারে অপরিজ্ঞাত থাকে নি। শৈশবকৈশোরে একদিকে যেমন শুনেছি পুরোহিতের মুখে শনি-সত্যনারায়ণ-লক্ষ্মীর পাঁচালি এবং গ্রহস্বস্ত্যয়নের মন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি শুনেছি সুগম্ভীর পিতৃকণ্ঠে বেদ-উপনিষদ পাঠ। খোলা বারান্দায় প্রত্যুষের অপস্রিয়মান অন্ধকার ; পিতার ভাস্করলোভন দেহের আর্জবে প্রথম আলোর রেখাঙ্কন ; তাঁর বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃতের উদাত্ত ধ্বনিতরঙ্গ, শব্দার্থ না বুঝেও অনুভব করতাম এমন এক উপস্থিতির যা মধুময় এবং অসংকুচিত, প্রোজ্জ্বল, স্বয়ম্ভর এবং নির্ভীক।

পরিবেশের মধ্যেও ছিল ধর্মের দুই সমান্তরাল ধারা। স্কুলরূপী গোয়ালটির দিন শুরু হ'ত ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা দিয়ে। পাড়ায় ছিল ছোটোবড়ো মন্দির এবং বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সার্বজনীন পূজা-পার্বণের প্রাচুর্য ; পরিজন পড়োশীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মাদুলি-তাবিজের চলন্ত বিজ্ঞাপন। উত্তর কলকাতার এই বাঙালী হিন্দুমধ্যবিত্ত অঞ্চলের বেশিরভাগ বাসিন্দাই ছিলেন কালীভক্ত ; তাঁদের হাম্বাধ্বনির মধ্যে শক্তির পরিচয় কতোখানি ছিল জানি না, কিন্তু তাতে যূথচারিতা এবং সংবেশনের প্রকাশ ছিল সুস্পষ্ট। কৃষ্ণভক্ত এবং রামভক্তদের পাড়া ছিল যথাক্রমে আরও কিছুটা উত্তরে এবং পশ্চিমে ; সামান্য খানিকটা পুবের দিকে এগোলে আল্লাভক্তদের দেখা মিলতো। সে-দিকটা আমাদের কাছে ছিল নিষিদ্ধ, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের দৌলতে কালীভক্ত এবং আল্লাভক্তদের মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশই সে-যুগে প্রবলতর হয়ে উঠছিল। সেই দাঙ্গাহাঙ্গামার যেসব বিবরণ বয়স্কজনদের মুখে আমরা শুনতাম তা পৌরাণিক সুরাসুর যুদ্ধের মতোই রঞ্জিত, রোমহর্ষক, এবং পৈশুন্যসর্পিল।

অপরপক্ষে পারিবেশিক অন্য ধারাটির সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটে নিতান্ত অল্পবয়সে। এটির প্রধান সূত্র ছিল রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথের গানে পূজা, প্রেম এবং প্রকৃতিকে আলাদা করা যায় বটে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা পরস্পরে অনস্যূত। তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক, এমনকি কবিতার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায় রবীন্দ্র-সংগীতে ধর্মচেতনার অভিস্রবণ প্রায় অনবচ্ছিন্ন। ঔপনিষদিক ব্রহ্ম থেকে পৌরাণিক শিব, বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ থেকে বাউলের মনের মানুষ তাঁর বিভিন্ন গানে কখনো পরিস্রুত, কখনো কেলাসিত, কখনো পরস্পরে অভিসারী, কখনো বা পর্যাবৃত্ত। পিতা, প্রভু, সখা, প্রেমিক, কবি, নর্তক, রহস্যময়ী নানা রূপে তাঁর দেবতা তাঁর কল্পনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছেন, এবং সুরের পরিণাহে সেইসব রূপ নাস্তিকের চেতনাতেও অন্তর্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের শোভন এবং সহিষ্ণু রূপও অল্প-বয়সেই আমি দেখেছি।

ফলত ধর্মে অনুরাগ থাকলে কৈশোরে যৌবনে একটি না একটি ধর্মীয় বিকল্প অবলম্বন করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। এমন কি আর-পাঁচজন শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর মতো আমিও বিকল্পবোধকে অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে অপাটবমুক্ত বিহারের কৌশল

অর্জন করতে পারতাম। নিজের নির্জ্ঞান নিজে বিশ্লেষণ করতে পারি এমন সামর্থ্য আমার নেই ; সুতরাং আমার নাস্তিক্যের পিছনে যদি কোন গূঢ়েষা থেকে থাকে তার নির্দেশ আমি দিতে পারব না। যতটুকু বুঝতে পারি আমার মধ্যে প্রথম থেকেই জিজ্ঞাসাবোধ অত্যন্ত প্রবল, এবং ধর্মবিশ্বাসে আশ্রয় না নেবার প্রধান কারণ সম্ভবত আমার মধ্যে এই বিপ্রতীপ প্রশ্নশীলতার উপস্থিতি। ধর্মবিশ্বাসে সব প্রশ্নেরই উত্তর মেলে ; কিন্তু অল্পবয়স থেকেই লক্ষ করতে শুরু করি যে সেসব উত্তরের মধ্যে না আছে সুসংগতি, না যায় তাদের মেলানো দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে। ধর্মীয় উত্তর প্রশ্নোর্ধ্বতা দাবি করে, এবং এই দাবিকে মেনে নেওয়া আমার কাছে কোনদিনই সংগত ঠেকে নি।

অবশ্য ধর্মের কোন সামান্যাভিধান পাওয়া শক্ত এটা কৈশোরেই নজরে আসে, এবং একদিকে ইতিহাসচর্চা ও অন্যদিকে নানাদেশে ঘোরার ফলে এ তথ্য ক্রমেই আরো স্পষ্টতর হয়েছে যে সমাজসভ্যতার মতো ধর্মের রূপও বিচিত্র। প্রতি ধর্মের শাখাপ্রশাখাও বহু, এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলের চাইতে অমিলই বেশি প্রত্যক্ষ। এই বৈচিত্র্য লক্ষ করার পরও সম্ভবত বলা চলে যে অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ যাকে ধর্ম আখ্যা দিয়ে থাকেন তার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে। এইসব লক্ষণের একটি বিস্তারিত তালিকা পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু নাস্তিকেরা যেসব কারণে ধর্মবিরোধী সেগুলিকে কিছুটা পরিস্ফুট করার জন্য এইসব লক্ষণের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ ও আলোচনা সংগত মনে করি। তারপর সেই প্রকরণে আমার কিছু জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করব।

দুই

সব ধর্মের কেন্দ্রেই কতকগুলি স্বকীয় প্রত্যয় বর্তমান, এবং প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ধর্মের অনুরাগীরা দাবি করে থাকেন যে তাঁদের ধর্মের স্বকীয় প্রত্যয়গুলি অপ্রতর্ক্য, অনপেক্ষ, সর্বজনীন এবং স্বয়ংসিদ্ধ। এই দাবির সমর্থনে কোন যুক্তি প্রমাণ মেলে না ; যখন কেউ কেউ যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা করেন, তখন বিশ্লেষণ করলেই চোখে পড়ে তা যুক্তি নয়, যুক্ত্যাভাস মাত্র। তথ্যসংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আবিষ্কার উদ্ভাবনের সূত্রে বিশ্বজগৎ এবং তার উপাদান ও পৃথিবীর অধিবাসী এবং তাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান গত তিনচার হাজার

বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্ধিত এবং পরিশ্রুত হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বজগতের আড়ালে তার স্রষ্টা, শাসক বা নিয়ামক হিসেবে ঈশ্বর, আল্লা বা যিহোবা নামে যাকে বিভিন্ন ধর্মে কল্পনা করা হয়েছে তার সম্পর্কে ধর্মবিশ্বাসীদের প্রধান নির্ভর আপ্তবাক্য। শুধু বিনাবিচারে ঈশ্বর, আল্লা বা যিহোবার অস্তিত্ব মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়; তারি সঙ্গে ধার্মিকেরা দাবি করেন যে বেদ অভ্রান্ত, বা গীতা কৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের নিজস্ব বাণী, বা যিহোবা মোজেসকে অথবা আল্লা মহম্মদকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর নির্দেশ প্রচারের জন্য, বা যীশু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, বা চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ব্যক্তি এক-একটি অবতার পুরুষ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এমনকি ঈশ্বর, আল্লা অথবা যিহোবা জাতীয় কাউকে যিনি আত্মসমর্থনে টানেন নি, সেই বুদ্ধ এমন পূর্ণজ্ঞান অর্জন করেছেন বলে দাবি করা হয়ে থাকে যে জ্ঞান প্রশ্নাতীত এবং প্রমাণাতীত।

এখন এই ধরনের দাবি মেনে নিলে তারই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে আরো অনেক দাবি স্বীকার করতে হয়। ধর্মের যাঁরা প্রবর্তক এবং প্রচারক প্রমাণ-নিরপেক্ষ প্রাধিকারের সূত্রে অতিপ্রাকৃত যে-কোন ঘটনাই তাঁদের ক্ষেত্রে সম্ভব। ফলে ভক্তদের কাছে বুদ্ধ হয়ে ওঠেন রহস্যাবৃত এক জাদুকর, মোজেস অনুচরদের নিয়ে অনায়াসে হেঁটে সাগর পেরিয়ে যান, কৌমার্য অক্ষত রেখেই মেরী জন্ম দেন যীশুকে, মহম্মদ সশরীরে স্বর্গে ঘুরে আসেন, কৃষ্ণ একই সঙ্গে বহু নারীতে উপগত হন, রামকৃষ্ণ ভক্তকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, অরবিন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর নাভিকুণ্ড থেকে অলৌকিক জ্যোতি উৎসারিত হতে থাকে, সাঁইবাবা হাত ঘুরিয়ে আঙটি, ঘড়ি-জাতীয় নাড়ু দেখান। অতিপ্রাকৃত এবং আপ্তবাক্যকে মেনে নিলে তখন আর আভ্যন্তরীণ সংগতি কিংবা প্রতিষঙ্গের প্রশ্ন তোলা চলে না। অতিপ্রাকৃতের সমর্থনে কোন যুক্তি-প্রমাণ মেলে না, এটাই ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে নাস্তিকের প্রধান দার্শনিক আপত্তি নয়; তার প্রধান আপত্তি ধর্মবিশ্বাসের প্রশ্নোর্ধ্বতার দাবি সম্পর্কে। জিজ্ঞাসার সূত্রে বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ; সেই জিজ্ঞাসাকে ধর্মবিশ্বাস রুদ্ধ করে বলেই নাস্তিকের বিচারে ধর্ম ক্ষতিকর। প্রকৃত বস্তু বা ঘটনায় অপ্রকৃতের আরোপ বা উৎপ্রেক্ষণ ধর্মমাত্রেরই বৃত্তি; এর ফলে সত্য-অসত্যের ভেদ অস্পষ্ট হয়ে আসে, প্রকল্পের বিচার ও পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে, জ্ঞানের বিকাশ ব্যাহত হয়।

কিন্তু ধর্ম যদি শুধুমাত্র অতিপ্রাকৃত এবং আপ্তবাক্যের প্রশ্নোর্ধ্বতা

দাবি করত তাহলে মানুষের ইতিহাসে তার প্রভাব হয়তো এতটা মারাত্মক হ'ত না। দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্ষমতা প্রয়োজন, এবং এই ক্ষমতার অন্যতম প্রধান সূত্র হচ্ছে সংগঠন। কোন একটি ধর্মের মূল প্রত্যয়গুলি যাঁর কল্পনায় প্রথম আকার পায় তিনি যখন লোকালয়ে সেই প্রত্যয়গুলির প্রচারে উদ্যোগী হন তখন তাঁর কিছু ভক্ত এবং অনুরাগী জোটে, এবং তাঁর স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের নিয়ে একটি ধর্মীয় সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠন নানা ধরনের হতে পারে; এবং সেই ধর্মের প্রভাব ব্যাপক হবে কি হবে না এবং যদি হয় তা হতে কতটা সময় লাগবে, তার একটা কাজচলা গোছের হিসেব করতে গেলেও নানা তথ্য জানা দরকার। কিন্তু মোটামুটি বলা চলে যেসব প্রত্যয়ীরা সম্প্রচারে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ এবং সেকারণে পর্বতে, গহ্বরে বা অরণ্যে অথবা মরুভূমিতে স্বেচ্ছায় বাস করেন, তাঁদের ধর্ম ব্যাপক কোন প্রভাব ফেলে কি না সন্দেহ। অপরপক্ষে অধিকাংশ প্রভাবশীল ধর্মের প্রচার প্রতিপত্তির ভিত্তি হচ্ছে সংগঠন, এবং প্রতিষ্ঠাতা নিজে যদি সংগঠক না হন তাহলে তাঁর অন্তত কয়েকটি তেমন ভক্তের প্রয়োজন ঘটে যাঁরা তাঁকে ওজস্বী ভাষায় বহুজনের সম্মুখে সম্প্রচারিত করবেন, এবং যাঁদের সংগঠনের সামর্থ্য অসামান্য। যীশুর এইরকম কয়েকটি প্রচারক ভক্ত জুটেছিল যাঁরা তাঁকে কেন্দ্র করে অজস্র অতি-প্রাকৃত ঘটনা এবং অতিকথা রচনা ও রটনা করেছিলেন। ভারতবর্ষে এ-জাতীয় উদাহরণের কোন অভাব নেই। গত শতকের শেষদিকে রামকৃষ্ণকে প্রাধিকারী খাড়া করে বীর্যবান ও বাগ্মী ভক্ত বিবেকানন্দ যে-সংগঠনটি গড়ে তোলেন মার্কিনের বিভিন্ন শহরে এখনো তার শাখা-গুলি সক্রিয়। তাঁর মডেল ছিলেন সম্ভবত জেস্যুইটরা, আবার তাঁর প্রতিষ্ঠানকে মডেল করে সম্প্রতিকালে অনেকগুলি হিন্দু মিশনারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে মার্কিনী তরুণ-তরুণী মহলে যাদের বিশেষ রবরবা।

এখন ধর্ম যখনই সংগঠনভিত্তিক হয়ে ওঠে তাতে কতকগুলি লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকে যাদের কোন যুক্তিতেই সমর্থন করা দুঃসাধ্য। যে-ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, কল্পনা এবং প্রত্যয়সমষ্টির উপাদানে একটি বিশেষ ধর্ম রচিত হয়েছিল তাঁর প্রাধিকারকে বিচারোর্ধ্ব করবার প্রয়োজনে তাঁর ওপরে দেবত্বারোপ অবশ্যম্ভাবী। ধর্মের সঙ্গে দর্শনের এটিই অন্যতম প্রধান পার্থক্য। বুদ্ধ নিজে নির্বাণের কথা বললেও চেলারা

ধর্মের সঙ্গে তাঁর এবং সঙ্ঘের শরণ নিয়েছেন ; অনাত্মবাদীকে দেবতা বানিয়ে স্তূপ, চৈত্য, বিহার ইত্যাদি পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে। তাঁর জীবনে নানা অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ মুখ্যত ভক্তদের প্রয়োজনেই কল্পিত[১]। অপরপক্ষে সক্রেটিসের ক্ষেত্রে দেবত্বারোপ বা তাঁর জীবনে অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমারোহ প্রয়োজন হয় নি কারণ তিনি কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নন, এবং প্লেটো তাঁর গুরুর প্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগী ছিলেন না। ভারতবর্ষে, এমনকি বাংলাদেশেও, ব্রাহ্মধর্ম যে বিশেষ জনসমর্থন পায় নি তার অন্তত একটি কারণ রামমোহন মহাব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হয়েও কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি দাবি করেন নি। এবং তাঁর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র অথবা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে দেবতা বা অবতাররূপে উপস্থিত করার প্রয়াস করেন নি। আসলে ব্রাহ্মধর্মের মূলেই একটি স্ববিরোধ চোখে পড়ে। রামমোহন একদিকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, প্রায়োগিক দর্শন এবং আরোহী অনুসন্ধানের প্রবল সমর্থক ; অন্যদিকে তিনি উপনিষদের তত্ত্বকে এমন প্রাধিকার দিয়েছেন যা ঘোষিতভাবে অপ্রতর্ক্য। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন রফা অকল্পনীয়। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে জ্ঞান শাশ্বত এবং অব্যয় রূপে কল্পিত, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জ্ঞান স্বীকৃতভাবেই সীমাবদ্ধ, বিচারসাপেক্ষ, পরিবর্তনশীল, সেখানে নতুন তথ্য আহরণ বা বিচার-বিশ্লেষণের ফলে প্রচলিত প্রকল্প ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে, এবং ফলে সেখানে জ্ঞান অস্মীভূত নয়, তা বিবর্ধমান। ব্রাহ্মধর্ম দুইয়ের মধ্যে রফা করতে গিয়ে ধর্ম হিসেবেও বিশেষ প্রসার লাভ করে নি, দর্শনরূপেও গড়ে ওঠে নি। অপরপক্ষে রামকৃষ্ণে দেবত্বারোপ করে বিবেকানন্দ শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও ভক্ত আকর্ষণ করেছিলেন, এবং তাঁর পরিকল্পিত সংগঠনের নিয়মানুগত্য, বিত্তসম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্তমানে অনেক রাজনৈতিক দল ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চাইতেও বেশি।

ধর্মীয় সংগঠন গড়ে উঠলে তখন তার কাজ শুধু প্রচারে আবদ্ধ থাকে না। যেসব প্রত্যয় এবং তাদের সঙ্গে জড়িত অতিপ্রাকৃত কাহিনী-কিংবদন্তী ধর্ম-সংগঠনের আদিম মূলধন, তাদের যাথার্থ্য সম্পর্কে কেউ সংশয়ী হলে তার কণ্ঠরোধ করার জন্য সংগঠন উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ধর্ম-সংগঠনের কর্মসূচীর একদিকে যদি থাকে আপ্তবাক্যের প্রচার, অন্য

দিকে তাহলে দেখা যায় জিজ্ঞাসুনিধন-যজ্ঞ। প্রচারের রূপটা মোটামুটি স্পষ্ট, কিন্তু নিধনক্রিয়া সবক্ষেত্রে সমান প্রত্যক্ষ নয়। খৃষ্টধর্ম এবং ইসলামের ইতিহাসে দুটি দিকই অত্যন্ত প্রবল; বাইবেল এবং কোরানের প্রচার শুধু শব্দের জাদুর উপরে নির্ভর করে নি, তার জন্য বারবার অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ ঘটেছে। যাঁরা অন্য ধর্মের লোক অথবা অবিশ্বাসী তাঁদেরই শুধু জবরদস্তি করে নিজের ধর্মে ভেড়াবার চেষ্টা হয় নি, নিজের ধর্মের মধ্যে যাঁরা কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যানে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ব্যত্যয়ী বলে তাঁদেরও প্রভূত অত্যাচার সইতে হয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মের এই হিংস্র অসহিষ্ণুতা আমাদের যুগে বর্তেছে ফ্যাসিজ্‌ম এবং কমুনিজ্‌ম নামা দুই রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। অন্তত এদিক থেকে শেষোক্তরা ধর্মীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।

আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুধর্মে এই হিংস্রতা তত স্পষ্ট নয়। তার কারণ নানা, কিন্তু কারণ যা-ই হোক হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও অন্তত দুটি প্রাসঙ্গিক লক্ষণ অগ্রাহ্য করা অসংগত। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে এক সময়ে চার্বাক এবং বৌদ্ধদর্শনে জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। চার্বাক বা লোকায়ত চিন্তার প্রতি সহিষ্ণুতার বিশেষ চিহ্ন এদেশে দেখা যায় না, বস্তুত ঐ চিন্তার সূত্রাদি যেভাবে বিকৃত এবং প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে তা থেকে ধর্মীয় হিংস্রতার ও অসহিষ্ণুতারই প্রমাণ মেলে[২]। বৌদ্ধজিজ্ঞাসা সম্ভবত বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব পূজার প্রভাবে নিজে থেকেই ক্ষীণ হয়ে আসে। দ্বিতীয় দিকটি এর চাইতেও বেশি ভয়াবহ। হিন্দুধর্মের মুখ্য বাহন সমাজ-সংগঠন, আচারবিচার, পূজা-প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের উচ্চজাতি বলে ঘোষণা করে এসেছেন অধম জাতিদের সম্পর্কে তাঁদের ধারণা এবং শেষোক্তদের প্রতি উচ্চজাতিদের আচরণ সব চাইতে অসহিষ্ণু এবং সহিংস ধর্মদেরও সম্ভবত হার মানায়। এদেশের ইতিহাসে তার প্রচুর পরিচয় বর্তমান; বস্তুত সমকালীন ভারতবর্ষেও অস্পৃশ্যদের প্রতি হিন্দু উচ্চজাতিদের ধর্মীয়-সামাজিক অসহিষ্ণুতা বিশেষ কমেছে বলে মনে হয় না। আইনের চোখে কেউই আর অস্পৃশ্য নেই বটে; সংবিধান অনুসারে তফসিলভুক্ত গোষ্ঠীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু যেখানেই ব্রাত্যগোষ্ঠীর কোন মানুষ সামাজিক জীবনে উচ্চবর্ণের মানুষের সঙ্গে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে সেখানেই উচ্চবর্ণের লোকেরা প্রবল আঘাত

হেনেছে। সংবাদপত্রে প্রায় প্রত্যহই 'হরিজন'দের উপরে সুপরিকল্পিত আক্রমণের বিবরণ প্রকাশিত হয়।

ধর্মবিশ্বাসীরা তুরীয় এবং অপার্থিবের কথা বললেও নথিপত্র থেকে দেখা যায় পার্থিবের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ কিছুমাত্র কম নয়। ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সংগঠন গড়ে উঠলেই জমিজমা, বিত্তপ্রতিপত্তির প্রয়োজন ঘটে; তখন আশ্রমকে কেন্দ্র করেই আকার নেয় জমিদারি, লেনদেন, মুনাফা ইত্যাদি। বৈষয়িক স্বার্থের খাতিরে ধর্মপ্রতিষ্ঠানেরা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে ওঠেন—তেমন শক্তি সঞ্চয় করতে পারলে তাঁরাই হন সেই ব্যবস্থার প্রধান ধারক এবং পরিচালক। অন্যথায় রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁরা খাতির পাতানোয় উদ্যোগী হন। এই ক্ষেত্রে পুব এবং পশ্চিমের অভিজ্ঞতায় খুব একটা ফারাক দেখা যায় না। চার্চই শুধু প্রচুর বিষয়সম্পত্তি করে নি; এদেশে মঠমন্দিরকে কেন্দ্র করেই বিস্তর জমিদারি ও মহাজনী কারবার গড়ে উঠেছে। সম্প্রতিকালে এই প্রক্রিয়ায় ছেদ ঘটেছে মনে করার কারণ দেখি না। শাদা, কালো, হলদে, গেরুয়া, লাল, নানা রঙের উর্দি চাপিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এখনো পরমার্থের নামে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করছেন এবং সেই অর্থ নানারকম মুনাফাজনক শোষণের ব্যবসায়ে খাটিয়ে যাচ্ছেন।

ধর্মের বিরুদ্ধে নাস্তিকের মুখ্য অভিযোগের একটি হল এই যে পাহারাওয়ালা এবং সৈন্যবাহিনীর চাইতেও অনেক বেশি সাফল্যের সঙ্গে ধর্মপ্রতিষ্ঠানরা প্রতিষ্ঠিত অসাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখায় সাহায্য করে এসেছেন। সব সমাজেই কম বেশি অসাম্য, অত্যাচার, শোষণ এবং পীড়ন বর্তমান। তার ফলে যে বিক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক, ক্ষমতাশালীরা তাকে দমন করার জন্য পাহারাওয়ালা এবং সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত করবেন, এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু গায়ের জোরে দমনের চাইতে মনের ভিতর থেকে বিক্ষোভকে সংবেশিত করা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে ঢের বেশি কাম্য। এই কাজটি ধর্মের মারফৎ সব চাইতে সাফল্যের সঙ্গে করা চলে। "আদিম পাপ"-এ কিংবা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস যদি ব্যাপক এবং দৃঢ়মূল করা যায় তাহলে গ্লানিকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিরর্থ হয়ে পড়ে। যা আছে তা অসংগত নয় এটা যদি একবার মেনে নেওয়া যায়, তাহলে পরিবর্তনের জন্য আর কোন উদ্যোগ উৎসাহ প্রবল হতে পারে না।

জিজ্ঞাসা সম্মোহিত হলে ধর্মবিশ্বাসীদের যেমন সুবিধে হয়, প্রতিষ্ঠিত অসাম্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ভিতর থেকেই ভোগবৃত্ত হলে সেই ব্যবস্থায় যাঁদের কায়েমী স্বত্ব আছে তাঁরা নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারেন। এক্ষেত্রে ধর্মের "অবদান" সুবিদিত।

জিজ্ঞাসার চাপে যদি আমি নাস্তিক হয়ে থাকি, সেই নাস্তিক্য প্রবলতর হয়েছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রতি ধর্মীয় প্রতিন্যাসের চেহারা লক্ষ করে। ছেলেবয়েস থেকে পথেঘাটে দেখেছি ভিখারী, কুষ্ঠরোগী, অর্ধাহারী অনাহারী স্ত্রী-পুরুষ। কেন তাদের এই অবস্থা এই প্রশ্নের উত্তরে শুনেছি পূর্বজন্মের পাপকর্মের এই নাকি ফল। পূর্বজন্মে কে কী করেছে ইতিহাসে তার কোন হদিশ মেলে না। অপরপক্ষে সমাজ-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলে এইসব দুঃখের কিছুটা হেতু নির্ণয় সম্ভব; এবং হেতু জানলে দুঃখ দূরীকরণের, অন্ততপক্ষে লাঘবের, প্রচেষ্টা করা যায়। বড়ো হয়ে দেখেছি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী, যুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, শুনেছি জার্মানীতে ইহুদিনিধনের ভয়াবহ কাহিনী, পড়েছি নিগ্রোদের ওপরে শ্বেতকায় মার্কিনীদের অত্যাচারের কথা, সভিয়েট ইউনিয়নে দাসশিবিরের বিবরণ। এসব দেখা জানা পড়ার পরও যারা বোঝাতে চেয়েছেন জগতে সব-কিছুর পিছনেই কোন মঙ্গলময় উদ্দেশ্য আছে, শেষপর্যন্ত সব অত্যাচার, অবক্ষয়, যন্ত্রণার পিছনে কোন পরমকারুণিক অস্তিত্ব সক্রিয়, তাঁদের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা সম্ভবপর ঠেকে নি। বরং মনে হয়েছে মার্ক্‌স্‌, ফ্রয়েড, রাসেল প্রভৃতির রচনায় মানবীয় অবস্থার কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের নির্দেশ পাওয়া যায়, এবং এই সূত্রগুলি পথনির্দেশক হলেও প্রশ্নোর্ধ্ব নয়। শরীরের মতো সমাজের ক্ষেত্রেও কারণ জানা থাকলে অস্বাস্থ্য থেকে স্বাস্থ্যের দিকে যাওয়ার চেষ্টা সম্ভবপর; এবং কোন পরমজ্ঞান দাবি না করেও (অথবা দাবি না করার ফলেই) চিকিৎসক যেমন দায়িত্বশীল ও সক্রিয় হতে পারেন, একজন বিবেকী নাস্তিকও নিজের জ্ঞানের সীমা সম্পর্কে সচেতন থেকেই তেমনি অসাম্য এবং অত্যাচারের প্রতি-কারের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন। তাঁর নির্ভর দেবতা, গুরু, মন্ত্র অথবা অতিপ্রাকৃত শক্তি নয়; তাঁর নির্ভর অভিজ্ঞতা, যুক্তি, মমতা, উদ্যোগ, সহযোগিতা এবং নিজের ও সকল মানুষের প্রতি অনড় দায়িত্ববোধ।

তিন

কিন্তু যদিও আমি চিন্তার দিক থেকে সম্পূর্ণভাবেই নাস্তিক, তা হলেও ধর্মকে স্রেফ এক ধরনের মানসিক আফিম বলে খারিজ করা আমার কাছে যুক্তিসংগত ঠেকে না। কেন ঠেকে না সেকথা বলার ভিতর দিয়ে ধর্ম সম্বন্ধে আমার কয়েকটি জিজ্ঞাসা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে আশা রাখি।

ধর্মীয় প্রত্যয়াবলীর সমর্থনে যেসব যুক্ত্যাভাস খাড়া করা হয়ে থাকে তারা যদিচ নিতান্তই নড়বড়ে এবং ধর্মপ্রচারের ইতিহাসে জিজ্ঞাসার উপস্থচ্ছেদ এবং মর্ষকাম ও ধর্ষকামের প্রাবল্য যদিও সবিশেষ প্রত্যক্ষ, তবু অন্তত তিনটি কারণে ধর্মকে আমি ব্যামোহমাত্র মনে করি না। প্রথমত এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে আমি দেখেছি এবং জানি যাঁরা ঘোষিতভাবে ধর্মবিশ্বাসী, কিন্তু যাঁদের চরিত্রে এবং আচরণে এমন সব গুণ উপস্থিত (যেমন করুণা, সততা, প্রসন্নতা, সৃষ্টিশীলতা, সেবাবৃত্তি, সাহস, সমভাব, ইত্যাদি) যা আমার বিচারে অত্যন্ত মূল্যবান্। তার অর্থ নয় যে এইসব গুণ ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। কিন্তু অন্তত এই বিশেষ স্ত্রীপুরুষদের ক্ষেত্রে এইসব গুণকে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা বোধহয় যায় না। ফলে মনে প্রশ্ন ওঠে, ধর্মের সঙ্গে এইসব গুণের সম্পর্ক কী? "চতুরঙ্গে"র জ্যাঠামশায়ের চরিত্রে যেসব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাদের উদ্ভব এবং পোষণের জন্য কোন ধর্মবিশ্বাস প্রয়োজন হয় নি। আমার সমকালীন ও ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত যে অল্প কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার চরিত্রে ও চিন্তায় প্রভাব ফেলেছেন—যেমন বার্ট্রাণ্ড রাসেল, মানবেন্দ্রনাথ ও এলেন রায়, রাজশেখর বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আলবের কামু প্রভৃতি—তাঁরা কেউই ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু যে অল্প কয়েকজন পরিচিত ধর্মবিশ্বাসীকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁরা কি ধর্মের আশ্রয় ছাড়া তাঁদের সদ্‌গুণগুলিকে শুভনাস্তিক্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারতেন? ধর্মবিশ্বাস যদি তাঁদের এইসব গুণাবলীর রক্ষণে এবং বিকাশে সাহায্য করে থাকে তাহলে নিজে নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সেই বিশ্বাসকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি না।

দ্বিতীয় কারণটি প্রথমটির চাইতে স্থানে কালে অনেক বেশি ব্যাপক। গত পাঁচহাজার বছরের ইতিহাসে একদিকে যেমন ধর্মীয় মূঢ়তা এবং অসহিষ্ণুতার অজস্র নজির মেলে, অন্যদিকে তেমনি শিল্পে, সংগীতে, কাব্যে ধর্মের বিস্তীর্ণ এবং গভীর প্রভাব নিতান্তই প্রত্যক্ষ।

আধুনিক যুগকে যদি বাদ দিই তাহলে সম্ভবত একথা বলা চলে যে মানুষের সৃজনশীল কল্পনা এবং বিবিধ শিল্পকর্মে তার রূপায়ণ অনেকখানিই ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা চিহ্নিত। সারনাথের বুদ্ধ, মথুরার বিষ্ণু, এলিফ্যান্টার শিব, অথবা মমল্লপুরের মহিষমর্দিনীকে বাদ দিয়ে এই উপমহাদেশে ভাস্কর্যের ইতিহাস অকল্পনীয়। ধর্মীয় স্থাপত্যের অসংখ্য বিস্ময়কর উদাহরণ দেখতে পাই মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের উৎকাক্ষায়ী গথিক ক্যাথিড্রালগুলিতে, পশ্চিম এশিয়ার নীলাভ মসজিদ মিনারেটগুলিতে, সাঁচী স্তূপে, ভুবনেশ্বর-কোনারক-খাজুরাহোর রূপোৎকীর্ণ মন্দিরগুলিতে। শুধু যে ভারতীয় সংগীতের একটি প্রধান অংশ ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত তা নয়, ইয়োরোপীয় সংগীতেও ধর্মীয় প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে প্রবল ও ফলপ্রসূ। ইয়োরোপীয় সংগীত যাঁরা উপভোগ করেন তাঁদের দার্শনিক চিন্তা যে-ধরনেরই হোক না কেন মোৎসার্ট, বেঠোফেন, হ্বাগনার কিংবা স্ট্রাভিন্‌স্কির তুলনায় বাখ্ তাঁদের কম প্রিয় নন। এরই সঙ্গে লক্ষণীয় যে সব দেশেই প্রাগাধুনিক যুগের কাব্যে ধর্ম খুব বড়ো অংশ জুড়ে আছে। দান্তের মহাকাব্য আজও আমাকে তেমনি মুগ্ধ করে যেমন করে অনেক বৈষ্ণব পদাবলী অথবা রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত। ফলত কোন নাস্তিক যদি সুবেদী এবং রসিক হন, শিল্প, সংগীত এবং সাহিত্যে যদি তাঁর অনুরাগ থাকে, তাহলে তিনি লক্ষ্য করতে বাধ্য যে ঐ জগতের অনেকটাই একদা ধর্মাশ্রিত ছিল, এবং আধুনিক যুগেও এই সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয় নি। বিশ শতকের কবিদের মধ্যে যাঁরা আমার বিশেষ প্রিয় তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন সুধীন দত্ত, এলুয়ার ও নেরুদা তেমনি আছেন রবীন্দ্রনাথ, রিল্‌কে ও এলিয়ট। অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, সাহিত্য অতীতেও রচিত হয়েছে; বর্তমান যুগে এই বিয়োগ অনেক বেশি ব্যাপক এবং পরিস্ফুট। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থাকে, ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে শিল্পকল্পনার সম্পর্ক কী ধরনের? এই সম্পর্ক কি সমাপতনের? দু'এর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে সন্নিধি দেখা দিয়েছিল তা কি আসলে আপতিক? অথবা এরা উভয়েই এক মানসউৎস থেকে উদ্ভূত? একের কৃশায়ণ অথবা অভিক্রান্তির ফলে অন্যটি প্রবল অথবা দুর্বল হয়? এলিয়ট, মারিতাঁ প্রমুখ অনেকে অভিযোগ করেছেন আধুনিককালে আর্টকে ধর্মবিশ্বাসের জায়গায় বসাবার চেষ্টা হয়েছে, এবং তাঁদের মতে এ-চেষ্টা নিতান্তই অপচেষ্টা।

এলিয়ট শুধু ধর্মবিশ্বাসী নন, তিনি এ-যুগের একজন প্রধান কবি এবং সাহিত্যসমালোচক। তাঁর এই অভিযোগকে সাহিত্যানুরাগী নাস্তিক কতটা গুরুত্ব দেবেন?

তৃতীয় কারণটি দ্বিতীয় কারণটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যদিও প্রথম কারণটির সঙ্গে তার যোগ আছে। প্রত্যেক ধর্মের কেন্দ্রে যেসব প্রত্যয় থাকে তাদের মধ্যে অনেকগুলিই নীতিজাতীয়, অর্থাৎ বিশ্বাসীদের কাছে সেগুলি উচিত অনুচিতের নির্ণায়ক। এইসব নীতির মধ্যে প্রচুর স্ববিরোধ থাকে এবং ফলে বাক্‌ছল ও ভণ্ডামিতে অভ্যস্ত না হলে ধর্মাচরণ নিতান্ত কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও বোধহয় বলা চলে যে প্রতি ধর্মের কেন্দ্রেই কতকগুলি নৈতিক নির্দেশ বিদ্যমান এবং বিশ্বাসীদের জীবনে এইসব নির্দেশের প্রভাব বহুপ্রসারী। মানুষের ক্ষেত্রে নীতিকে বাদ দিয়ে কী ব্যক্তিগত কী সামাজিক জীবন দুই-ই অকল্পনীয়; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এমনকি এই আধুনিক যুগেও ধর্মের প্রাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নীতিনির্দেশের প্রতি আনুগত্যের কথা ভাবতে পারেন না। মানুষের বোধবুদ্ধির কাছে অহিংসানীতির আবেদন প্রত্যাশিত; কিন্তু জীবনে যাঁরা অহিংসানীতির অনুসরণে উদ্যোগী, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় সূত্রে এই নীতি গ্রহণ করেছেন। কেউবা এই আদর্শে দীক্ষিত হয়েছেন বৌদ্ধ অথবা জৈন ধর্মের সূত্রে, কেউবা খৃষ্টধর্ম বা বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে। অহিংস নাস্তিক মানবতন্ত্রী অবশ্যই আছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সংগঠনমূলক কাজে তাঁদের উপস্থিতি কম চোখে পড়ে। সেবানীতির ঔচিত্য সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়; কিন্তু দুঃস্থিত জনের সেবায় যাঁদের জীবন নিয়োজিত তাঁদের মধ্যে এমন ব্যক্তি খুব বেশি মেলে না যাঁরা আপন আপন ধর্মবিশ্বাস থেকে সেবাব্রতের নির্দেশ পান নি। গৃহযুদ্ধের প্রচণ্ড আবর্তের মাঝখানে আমি দেখেছি করুণাময়ী ক্যাথলিক সেবিকাকে যিনি গভীর নিষ্ঠায় সর্বজনের পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগীদের একাকী শুশ্রূষা করছেন। মহামারীর কেন্দ্রে দেখেছি বৌদ্ধ ভিক্ষুকে যিনি বিসূচিকাক্রান্ত রোগীদের সেবা এবং চিকিৎসা করছেন। তাঁদের সাহস, করুণা, সেবাবৃত্তি, সংগঠনসামর্থ্য ও দক্ষতা আমাকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করেছে। কাব্য, ভাস্কর্য, সংগীতের মতোই অহিংসা এবং সেবাকে আমি জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করি। রবীন্দ্রনাথ, রোদ্যাঁ অথবা আলাউদ্দিন খাঁর মতো মাদার টেরেসার ভিতরেও আমি মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দেখতে পাই। কোন ধর্ম বিশ্বাস যদি এই

নীতিবোধের সহায়ক হয়, তাকে অগ্রাহ্য করা অন্তত আমার বিচারে অসংগত ঠেকে।

অর্থাৎ যদিও আমি মনে করি দেবতা, ঈশ্বর, আত্মা, অতিপ্রাকৃত ইত্যাদি মানুষের কল্পনামাত্র এবং মানুষের পূর্বে ও পরে অথবা মানুষকে বাদ দিয়ে এদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তবুও ধর্মকে শুধুমাত্র ক্ষতিকর মনে করা আমার বিচারে অভিজ্ঞতাসম্মত নয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, যেসব গুণ এবং ক্রিয়াকে আমরা মূল্য দিয়ে থাকি ধর্মীয় প্রত্যয় এবং চেতনার সঙ্গে তাদের কোন আবশ্যিক ও সার্বিক যোগ আছে কিনা। এ জাতীয় প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর মেলা সহজ নয়, কিন্তু এ-প্রশ্ন নিয়ে যাঁরা মুক্তমনে বিচার করবেন তাঁদের কয়েকটি কথা স্মরণে রাখা দরকার। প্রথমত, ইতিহাসে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এমন কিছু ব্যক্তির পরিচয় মেলে যাঁরা পূর্বোক্ত গুণরাজির অধিকারী, কিন্তু যাঁরা ধার্মিকতার দ্বারা চিহ্নিত নন। এপিকুরসের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ তথ্য মেলে না; কিন্তু জীবনকে একটি উদ্যানের মতো করে গড়ে তোলার যে আদর্শ তিনি উপস্থিত করেছিলেন তা থেকে তাঁর চরিত্রের কিছুটা নির্দেশ মেলে এবং সেটি ধার্মিকতার নয়। জিজ্ঞাসু সক্রেটিস অথবা বিদ্রোহী স্পার্টাক্যাস কি ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন? অথবা উনিশ-শতকী বাংলার প্রায়নিঃসঙ্গ সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? আমার ব্যক্তিগত পরিচিতদের মধ্যে নাস্তিক এবং বিবেকী পুরুষ হিসেবে মনে পড়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে, অন্ধ্রপ্রদেশের গান্ধীবাদী "গোরা"কে, মহারাষ্ট্রের তারকুণ্ডেকে, গুজরাটী ভাবুক এ. বি. শাহ্-কে, কলকাতার নির্মলকুমার বসুকে। এইসব উদাহরণ থেকে কোন সাধারণ সূত্র প্রমাণিত হয় না। শুধু এইটুকু বোধহয় বলা চলে যে ধর্মীয় প্রত্যয় ছাড়াও বিবেকের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত। তা থেকে কি এই অনুমান অসংগত যে অহিংসা, সেবা, করুণা, বীর্যবত্তা, সততা, দায়িত্ব-বোধ, ইত্যাদি গুণ অনেকের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা সমর্থিত হতে পারে, কিন্তু তাদের উৎস ধর্মবিশ্বাস নয়? সেই উৎস কি মানব-অস্তিত্বের এমন কোন গূঢ় দিক যা থেকে নীতিবোধ এবং ধর্ম উভয়েই নিজের নিজের সমর্থন সংগ্রহ করে? এমন প্রস্তাব কি বিচার্য নয় যে মানুষ-নামক জৈব-সামাজিক প্রাণীটি জন্মসূত্রেই বিকল্প চেতনা ও দায়িত্ববোধের দ্বারা চিহ্নিত, এবং ধর্ম, সমাজসংগঠন, নীতি, শিক্ষা,

আইনকানুন, ইত্যাদি এই বোধকে পুষ্ট, বিশীর্ণ অথবা বিকৃত করতে পারে?

দ্বিতীয়ত শিল্পসাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মবিশ্বাস একটি বড়ো ভূমিকা নিয়ে থাকলেও নির্ধারিত কোন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এমন শিল্পসাহিত্য পূর্বেও রচিত হয়েছে, এবং গত দুশো বছর ধরে বিভিন্ন সমাজে ধর্মবিশ্বাস থেকে বিযুক্ত শিল্পসাহিত্য ক্রমে প্রধান হয়ে উঠেছে। তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবার আগে বৌদ্ধধর্মে নারীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি। সাঁচীর তোরণে যে তুলনাবিহীন যক্ষীমূর্তিরূপ পেয়েছে অথবা অজন্তার গুহাগাত্রে একদা যে নারীরূপের বন্দনা ঘোষিত হয়েছিল, তার প্রেরণা কি নির্বাণতত্ত্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিশ্বাস? মেঘদূত অথবা অমরুশতক কি ধর্মীয় কাব্য? কাটুল্লুস, প্রপারটিউস, লি পো অথবা পেত্রার্ক কি ধর্মীয় কবি? দার্শনিক কবি লুক্রেটিউস তো ঘোষিতভাবেই নাস্তিক, জড়বাদী, এপিকুরসপন্থী। কিন্তু শেক্সপীয়র অথবা গোয়েটের মহৎ সাহিত্যকর্মের ভিত্তি কি কোন নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস? টম জোন্‌স্‌, ট্রিস্ট্যান শ্যাণ্ডি, জ্যাক ও তার প্রভু থেকে শুরু করে স্তাঁদাল, ফ্লোবেয়ার, প্রুস্ত্‌, কাফ্‌কা, লরেন্স, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা সৈয়দ ওয়ালিউল্লার বিভিন্ন বিচিত্র উপন্যাসরাজির যে বিস্ময়কর পরম্পরা তার সঙ্গে কোন ধর্মবিশ্বাসের কি আদৌ সম্পর্ক আছে? হ্বাগ্‌নার অথবা স্ট্রাভিন্‌স্কীর সংগীত কি কোন ধর্মবোধ থেকে উৎসারিত? অথবা ব্রানকুসীর ভাস্কর্য, রেনোয়া কিংবা পিকাসোর ছবি? রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে তাঁর ধর্মবিশ্বাস উদ্‌ভাসিত, কিন্তু তাঁর ছবি সম্বন্ধে একথা কি বলা চলে?

বস্তুত যেসব শিল্পসাহিত্য সংগীতের প্রেরণা এবং উপজীব্য প্রত্যক্ষভাবেই ধর্মীয়, দেশকাল পেরিয়ে যখন তারা ভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষদের মনে আবেদন করে, তখন সেই আবেদনের প্রকৃতি কি ধর্মীয় সহানুভূতি থেকে স্বতন্ত্র নয়? শার্ত্‌-এর ক্যাথিড্র্যাল সুবেদী দর্শকচিত্তে যে সম্ভ্রমান্বিত বিস্ময়ের উদ্রেক করে তা কি শুধু বিশ্বাসী ক্রিশ্চানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ? খাজুরাহোর মহাদেও মন্দিরের ঐশ্বর্যে সাড়া দেবার জন্য শৈব হওয়া কি প্রয়োজন? আমাদের তৃষিত চেতনায় বৃষ্টির ধারার মতো যখন রবীন্দ্রসংগীত নামে তখন তার রস গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসে অংশভাক্‌ হওয়া কি সকলের পক্ষেই নিতান্ত জরুরী?

ফলত ধর্মের জগৎ এবং শিল্পের জগৎ দীর্ঘকাল ধরে পরস্পর থেকে গ্রহণ করে থাকলেও এ দুটি কি আলাদা জগৎ নয়? সম্প্রতিকালে এ দুয়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে, অন্তত পশ্চিমে, অবসন্নতা প্রকট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও একথা কি আদৌ বলা চলে যে শিল্পের ক্ষেত্রে গত একশো-দেড়শো বছরে নবনবোন্মেষ-শালী প্রতিভার অভাব ঘটেছে? স্তাঁদাল-বালজাক-ফ্লোবেয়ারের পর এসেছেন প্রুস্ত্, জিদ, কামু, সার্ত্র্; দেগা-রেনোয়া-গোগ্যাঁর পরে মাতিস্, পিকাসো, জ্যাকসন পোলক, সিডনি নোল্যান; হাউপ্ট্ম্যান-ইবসেনের পর পিরাণ্ডেলো, ব্রেশ্ট্, বেকেট, হখ্হুথ, পিটার হ্বাইস। আসলে ধর্ম এবং শিল্পের নিগূঢ় সাধারণ উৎস কি সেই আশ্চর্য মানবীয় শক্তি নয় যার নাম কল্পনা? যা নেই তাকে এই শক্তিরূপ দেয়, এবং সেই রূপ এমন প্রাণময় হতে পারে যে যা আছে তার চাইতে এই কল্পিত রূপ আমাদের কাছে বেশি প্রত্যক্ষ ঠেকে। এই কল্পনাশক্তি ধর্ম ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল সক্রিয় ছিল, কিন্তু উৎসের একতা এবং বহু শতাব্দীর সহযোগ সত্ত্বেও এই দুই ক্ষেত্রের কল্পজগতের মধ্যে কিছু কি মৌলিক ফারাক আগাগোড়াই ছিল না? শিল্পের কল্পজগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি নিরাসক্ত এবং অপ্রয়োগবাদী নয়? অর্থাৎ শিল্পে যেখানে এবং যখন শিল্পরূপ স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত হয় সেখানে এবং তখন এই প্রয়োগহীন নিরাসক্ত সম্ভোগই কি তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে চিহ্নিত করে না? অপরপক্ষে ধর্মের কল্পজগৎ অনেকটাই কি প্রত্যাশাপূরণের আশার দ্বারা বিধৃত নয়? যজ্ঞই হোক আর পূজাই হোক তার পিছনে লোভের উপস্থিতি কি একেবারেই অপ্রত্যক্ষ —বিত্তের লোভ, ক্ষমতার লোভ, যশের লোভ, অন্যায় করে শাস্তি না পাওয়ার লোভ, স্বর্গের লোভ, পুনর্জন্ম হতে মুক্তির লোভ, শান্তির লোভ, এইসব নানাবিধ লোভই কি প্রার্থনারূপে প্রকাশিত হয় না? অবশ্য প্রার্থনাহীন ধর্মও আছে, কিন্তু সে-ধর্ম খুব কম মানুষকেই আকৃষ্ট করে। পূজা, প্রার্থনা, লাভের প্রত্যাশা—এসব বাদ দিলে ধর্মের কল্পজগৎ শীর্ণ হয়ে পড়ে। লোকেরা বুদ্ধ, রাম, হনুমান, খৃষ্ট ইত্যাদির শরণ নিয়ে থাকে, কিন্তু কালিদাসের যক্ষ অথবা শেক্সপীয়রের হ্যামলেট আমাদের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করে তা নিরাসক্ত এবং প্রয়োগপ্রত্যাশামুক্ত। অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে শিল্পের যে ব্যবধান আধুনিক ইতিহাসে প্রত্যক্ষভাবে বিবর্ধমান সেটির সূত্র হয়তো

সমকালীনে সীমাবদ্ধ নয়, হয়তো আগাগোড়াই দুই কল্পজগতের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম এবং অর্থপূর্ণ পার্থক্য বিরাজমান।

চার

এখন কল্পনা যদিও একটি বিশিষ্ট মানবীয় শক্তি তবু উপাদান-সংগ্রহ এবং সক্রিয়তার জন্য তাকে মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, অনুভব, বৃত্তি এবং ভাবের উপরে নির্ভর করতে হয়। নানা ধর্মের মধ্যে মানবকল্পনার যেসব বিচিত্র প্রকাশ চোখে পড়ে তা থেকে দু'একটি সম্ভাব্য সূত্রের এবং সেইসব সূত্রের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নের উল্লেখ করে এই আলোচনায় আপাতত ইতি টানব।

সন্ত্রাসবোধ এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা সম্ভবত সব প্রতিষ্ঠিত ধর্মেরই একটি সামান্য লক্ষণ। এই সন্ত্রাসবোধ স্বাভাবিক, এবং এ থেকে কোন মানুষই যে কোনদিন সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবেন এমন আশা আমার অন্তত নেই। মানুষের তুলনায় যে বিশ্বপ্রকৃতিতে তার বাস তা এতই বিরাট যে অধিকাংশ মানুষের পক্ষে তার সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য ধারণা করাই কঠিন। আংশিকভাবে ছাড়া এই বিশ্বপ্রকৃতির মানবীয় নিয়ন্ত্রণ অকল্পনীয়। ভূমিকম্পে, প্লাবনে, ঝড়-ঝঞ্ঝায় প্রকৃতির প্রবল এবং উদ্দেশ্যহীন শক্তি বারবার ব্যক্ত হয়, এবং এই অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের অসহায়তা ত্রাসচিহ্নিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বন্যা ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা ছাড়াও মানুষের সন্ত্রাসের অন্য বহু কারণ আছে। মৃত্যু প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অনিবার্য; যৌবনের পরে জরাকেও কেউ ঠেকাতে পারে না; অধিকাংশ মানুষের জীবনে ব্যাধি প্রায় নিত্যসঙ্গী। যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, দুর্বলের উপরে প্রবলের অত্যাচার, আহার এবং আশ্রয়ের অনিশ্চয়তা—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এইসব অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষে পরিচিত। দেহের ঘেরের দ্বারা আমরা প্রত্যেকেই অপর থেকে বিচ্ছিন্ন, অথচ বাঁচবার প্রয়োজনে আমাদের যেমন আহার এবং আশ্রয় দরকার তেমনি দরকার স্নেহ-ভালোবাসা-বন্ধুত্বের, নির্ভরযোগ্য পারস্পরিক সম্পর্কের। এ সবই দুর্লভ, কিন্তু যদি-বা তেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা যে টি঺কবে এমন নিশ্চয়তা নেই। ব্যাধি এবং মৃত্যু প্রিয়জনকে সরিয়ে দেয়; মনের নানা মর্ষকামী এবং ধর্ষকামী গূঢ়েষা বন্ধুতাকে রূপান্তরিত করে শত্রুতায়, নৈকট্যের জায়গায় আনে অনতিক্রম্য ব্যবধান। ভয় তাই

মানুষের অস্তিত্বের অংশ এবং এই ভয় থেকে মুক্তি মানুষ মাত্রেরই কাম্য।

আর এই ভয়ের সর্বজনীন অভিজ্ঞতা এবং তা থেকে উদ্ধারের এই যে সার্বজনিক কামনা—উভয়কে নিজের অঙ্গীভূত করে বলেই কি ধর্মের আবেদন এত ব্যাপক এবং গভীর? যে-সংসারে সবই অনিশ্চিত, যেখানে রবীন্দ্রনাথের মতো আশ্চর্যভাবে সৃষ্টিশীল প্রতিভা বহু সময়ে মনে করেন তাঁর জীবনে "কিছুই তো হল না," সেখানে সব মানুষের না হোক বেশিরভাগ মানুষেরই চাই এমন কোন নিশ্চয়তা যা অবলম্বন করে সে বাঁচতে পারে। এই অনাক্রম্য নিশ্চয়তা শুধু ধর্মই দিতে পারে, কারণ ধর্ম যে কল্পনাকে রচনা করে তা অপ্রতর্ক্য কিন্তু নিরাসক্ত নয়। তাকে বিচার করা যায় না, কিন্তু তার উপরে নির্ভর করা যায়। ধর্ম একদিকে মানুষের ভয়, অসহায়তা, যন্ত্রণা এবং ব্যর্থতার একটা ব্যাখ্যা দেয়, অন্যদিকে ধর্ম এই দশা থেকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি আনে। প্রতিশ্রুতির আবেদনকে প্রবলতর করার জন্য প্রায় সব ধর্মেই মানুষের আত্মপ্রত্যয়কে ক্ষীণ করে হীনতাভাবকে বাড়াবার চেষ্টা হয়। মানুষ মোহমুগ্ধ জীব, অথবা আদিম পাপে তার জন্ম—জাগতিক দুঃখের এই ধরনের ব্যাখ্যার পর আশ্বাস দেওয়া হয় বুদ্ধ, শিব, বিষ্ণু অথবা খৃষ্টের শরণ নিলে আর ভয় থাকবে না। এঁরা প্রত্যেকেই শঙ্কাহরণ ও দুঃখহরণ—এঁরা করুণা করলে পাপ-তাপ দূরীভূত হয়। যাঁরা হয়তো-বা ঐতিহাসিক চরিত্র ধর্মের জাদুতে তাঁরাও দেবতা হন, এবং যেহেতু ভয় থেকে উদ্ধারের ভরসাটাই আসল কথা সে-কারণে এই দেবত্বারোপে ভক্তদের আপত্তি কচিৎ উচ্চারিত হয়।

প্রশ্ন হল, ভয়ের অভিজ্ঞতা এবং ভয় থেকে উত্তরণের কামনা যদি মানব অস্তিত্বের সাধারণ লক্ষণ হয় তাহলে ধর্মীয় প্রত্যয়ের উচ্ছেদ কি আদৌ কল্পনীয়? আমরা জানি যে জ্ঞান, কর্ম, শিল্পসাধনা অথবা সেবার সূত্রে কিছু মানুষ ভয়কে সংযত করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা পারে কি? যদি না পারে তাহলে ধর্মপ্রত্যয়ই কি তাদের একমাত্র অবলম্বন? ঈশ্বরোনাস্তি সত্বেও ঈশ্বর এবং তার ছাপোষাদের উদ্ভাবন কি মানুষের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী? যাঁরা প্রচলিত অর্থে ধর্মবিশ্বাসী নন সেই কম্যুনিস্টরাও যখন ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিকতায় দেবত্বারোপ করেন তখন তার দ্বারা তাঁরা কি মানবীয় দুর্বলতারই প্রমাণ দেন? ধর্মের স্তোভবাক্য ছাড়া মানুষের চলবে না এ-প্রস্তাব আমার মতো যাঁরা

মানুষের আত্মসৃজনক্ষমতায় বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রত্যয় প্রমাণ নয়, এবং ফলে মনের মধ্যে এ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থেকে যায়।

ভয় যদি মানুষের অস্তিত্বের একদিক হয় বিকাশের উৎকাঙ্ক্ষা তার অন্যদিক। মানুষ শুধু স্মৃতি আর বর্তমানের ভিতরে নিজেকে নিবদ্ধ রাখে না, তার অতীত এবং সমকাল ভবিষ্যতের কল্পনার সঙ্গে যুক্ত। কোন অবস্থাই মানুষের কাছে শেষ অবস্থা নয়, তা থেকে প্রকৃষ্টতর অবস্থার কথা সে ভাবতে পারে, এবং সেই অবস্থার দিকে যাবার চেষ্টা করতে পারে। এই উৎকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত বৃত্তি, কোন স্তোভবাক্য বা ঐশ্বরিক-ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির উপরে এটি নির্ভর করে না। মানুষের ইতিহাসে নানাভাবে এই উৎকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়—শিল্পসাহিত্যে, অন্বেষণ-উদ্ভাবনে, সমাজসংস্কার ও সমাজবিপ্লবে, ধর্মকল্পনায়। এই উৎকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষর চক্রযান ও অর্ণব-পোতের উদ্ভাবনে, ইলোরার কৈলাস মন্দিরে, নভস্পৃক্ ক্যাথিড্রালে, স্যার টমাস মোরের "ইউটোপিয়া" গ্রন্থে, নানা দেশের লোকগীতিতে, সমাজতান্ত্রিক এবং নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন এবং আদর্শে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী পরিকল্পনায়। ধর্মের ক্ষেত্রে এই উৎকাঙ্ক্ষা যে কদাচিৎক নয় তার প্রচুর উদাহরণ মেলে। তাহলে যে হীনতাবোধ, নির্বেদ, বস্তুরতি এবং মর্ষকাম বেশিরভাগ ধর্মে প্রবলভাবে প্রত্যক্ষ তার প্রকরণে এই উৎকাঙ্ক্ষা কি করে টেঁকে? হয়তো একদিকে সন্ত্রাসবোধ আর তা থেকে অভয়ের স্তোভবাক্য এবং অন্যদিকে বিকাশের উৎকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম প্রতি ধর্মের মধ্যেই বিরাজমান; হয়তো এই বৈপরীত্য ধর্মের মধ্যে গতি সঞ্চার করে। ধর্ম প্রবলভাবে মানুষের ক্ষতি করে যখন ভয় এবং তা থেকে মুক্তির সংবেশনী প্রতিশ্রুতি ধর্মে প্রাধান্য পায়। অপর পক্ষে, যে ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে বিকাশের স্বতোবৃত্ত আকল্প সক্রিয় তাদের অগ্রাহ্য করা অসংগত।

কিন্তু বিকাশের উৎকাঙ্ক্ষা যদি কোন ধর্মে প্রাধান্য পায় তাহলে সেই ধর্ম কি আর ধর্মরূপে বহুজনকে আকৃষ্ট করতে পারে? শ্রুতি অথবা ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার অপ্রতর্ক্য প্রাধিকার, নীতিনির্দেশের পিছনে অতিপ্রাকৃতের সংস্থান, পূজাপ্রকরণের দ্বারা লোভনীয়কে লভ্য করার প্রত্যাভূতি এবং ভয়কে জয় করার আশ্বাস—অর্থাৎ ধর্মের লোকসমর্থন যেসব সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়—বিকাশের উৎকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেলে তার চাপে

এগুলির কি অবক্ষয় ঘটবে না? যদি ঘটে তা নিয়ে মাথাব্যথা তাঁদেরই যাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে মাতব্বর, এবং সেই মাতব্বরীর জোরে সমাজে বিত্ত এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। অপরপক্ষে যাঁরা ধর্মের আধিবিদ্যক প্রকল্পকে অগ্রাহ্য করেও ধর্মের মধ্যে উৎকাঙ্ক্ষায়ী বৃত্তির কিছুটা প্রকাশ দেখে তার কোন কোন রূপকে তারিফ করে থাকেন, তাঁরা এই ঘটনাকে স্বাগত করবেন বলেই মনে হয়। প্রেমে, সেবায়, সৃষ্টিতে, সততায় এবং পারস্পরিক সহযোগে এই মানবীয় উৎকাঙ্ক্ষা যদি উৎসারিত হয় তাহলে প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমূহের অভিক্রান্তি আদৌ কোন শূন্যতা সৃষ্টি করবে এমন আশঙ্কার কারণ দেখি না[৪]।

রেনেসাঁস ও ইতিহাসতত্ত্ব

Historical knowledge is the answer to definite questions, an answer which must be given by the past ; but the questions themselves are put and dictated by the present—by our present intellectual interests and our present moral and social needs.

Ernst Cassirer, *An Essay on Man*, পৃষ্ঠা ২২৬

এক

যে-ঘটনাবলীর নির্দেশক হিসেবে আদিতে রেনেসাঁস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল তার স্থান-কাল-পাত্র সবই ছিল ইয়োরোপীয়। কিন্তু এখন আর এই শব্দটির প্রয়োগ ইয়োরোপের চৌহদ্দির মধ্যে আটক নেই। অন্যান্য অঞ্চলের বেশ কিছু ভাবুক আপন-আপন দেশের নব্য যুগের চিন্তায়নে এই শব্দটিকে কাজে লাগিয়েছেন। কাজটি সংগত না অসংগত সেটি অবশ্যই বিচার-সাপেক্ষ ; তবে চীন ও জাপান, আরব ও আফ্রিকা, মেক্সিকো মায় মার্কিন দেশ সম্পর্কেও ঐতিহাসিকরা যখন রেনেসাঁস শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং করছেন তখন শব্দটিতে যে বিশেষার্থ ছাড়াও একটি সামান্যার্থ আরোপিত হয়েছে এটি আজ অনস্বীকার্য[১]।

এই ব্যাপকতার কারণ স্পষ্ট। আধুনিক ইতিহাসে ইয়োরোপের শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের কাহিনী সুবিদিত। এই বিস্তারের ধাক্কায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে অনেকগুলি আন্দোলন দেখা যায় যাদের সঙ্গে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের আংশিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। ঐসব আন্দোলনের আপন-আপন দেশে যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁরা এই সাদৃশ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে এই সচেতনতার বিস্তর প্রমাণ মেলে। রামমোহন ভারতবর্ষে বেকনীয় বিপ্লব শুধু কাম্য ভাবেন নি ; ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনীয় রূপান্তর স্বদেশেও ঘটেছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। ডিরোজিওর ছাত্ররা, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ

প্রমুখ অনেকেই সমকালীন বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের সঙ্গে পশ্চিমী রেনেসাঁসের সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন। তাঁদের অনুসরণে পরবর্তী ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বঙ্গদেশের উনিশ-শতকী ইতিহাস-পর্বকে রেনেসাঁস আখ্যায় চিহ্নিত করেন। জাকারিয়াস, সুশোভন সরকার, কালীকিঙ্কর দত্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডেভিড কফ প্রমুখের রচিত বা সম্পাদিত বইগুলির নামকরণে এই সাদৃশ্য বিঘোষিত।

কিন্তু সকলেই যে এই সাদৃশ্য মেনে নিয়েছিলেন তা নয়। সম্ভবত মানবেন্দ্রনাথ রায়ই প্রথম ভারতীয় ভাবুক যিনি স্পষ্ট করে বলেন যে পশ্চিমী রেনেসাঁসের সদৃশ আদৌ কিছু এদেশে এযাবৎ ঘটে নি। বিশের দশকে যখন তিনি কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও প্রবক্তা তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন ; পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তায় নানা পরিবর্তন ঘটলেও এই সিদ্ধান্তে তিনি অটল থাকেন[২]। বিশের দশকে তিনি ছিলেন কায়মনোবাক্যে মার্ক্সপন্থী ; তৎকালে তাঁর বিশ্লেষণের প্রধান ঝোঁক ছিল সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও আর্থিক-রাজনৈতিক শক্তি-সম্পর্কের উপরে। তাঁর মার্ক্সপন্থী বিচারে রেনেসাঁস বুর্জোয়া বিপ্লবের ভাবগত প্রতিরূপ মাত্র ; এবং যেহেতু ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী আদিতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণীর দালাল এবং পরে শেষোক্তদের কনিষ্ঠ অংশীদার ছাড়া আর কিছুই নয়, সেহেতু ভারতবর্ষে কোনবিধ সমাজবিপ্লব ঐ শ্রেণীর না অভিপ্রেত না সাধ্যায়ত্ত। তাঁর তৎকালীন বিশ্লেষণ অনুসারে ঐ উপমহাদেশের শ্রমিক, কৃষক এবং র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসই সমাজবিপ্লব ঘটাতে সক্ষম, এবং এই বিপ্লবই প্রকৃত স্বাধীনতার উপায় এবং উদ্দেশ্য। কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০), তাঁর বিখ্যাত বই "ইণ্ডিয়া ইন ট্র্যানজিশান"-এ (১৯২২) তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা "দি ভ্যানগার্ড" ও "দি ম্যাসেস"-এর পৃষ্ঠায় এবং অন্যান্য রচনায় মানবেন্দ্রনাথ কখনো সংক্ষেপে কখনো সবিস্তারে এই বক্তব্য উপস্থাপিত করেন।

ত্রিশের দশকের প্রধান অংশ (১৯৩১-৩৬) তাঁর কাটে দুঃসহ একক বন্দীদশায় ভারতের বিভিন্ন কারাগারে। কমিণ্টার্নে তাঁর এক সময়ের সহকর্মী আন্তোনিও গ্রাম্‌স্‌কি-র মতো তিনিও জেলে বসে মার্ক্সপন্থা, ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর ভাবেন ও লেখেন ;

প্রায় সাড়ে-তিন হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপী তাঁর এই পাণ্ডুলিপিটির অনেকটাই এখনো পর্যন্ত অপ্রকাশিত[৩]। তবে যে-অংশটুকু প্রকাশিত তা থেকে এটুকু অন্তত স্পষ্ট যে আর্থিক-সামাজিক সংগঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত থেকেই তিনি ইতিহাসে সংস্কৃতির নিজস্ব ভূমিকাকে ক্রমে বিশেষ মূল্য দিতে থাকেন; পরবর্তীকালে তাঁর "মৌল মানবতন্ত্রী" দর্শনে এই ভূমিকা প্রাধান্য পায়। পশ্চিমে ফাসিজম্-এর অভ্যুত্থানকে যেমন তিনি আর পুঁজিবাদী সংকটের প্রকাশমাত্র হিসেবে ব্যাখ্যা না করে তার পিছনে যুক্তি-ও-মুক্তি-বিরোধী প্রতিন্যাস ও ভাবাদর্শের প্রবল ঐতিহ্যের প্রতি বিবেকীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তিনি তেমনি কংগ্রেসী ও লীগ নেতৃত্বের শূন্যগর্ভতার সূত্র-রূপে শুধু নিরুপস্থ দেশী বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থ নয়, এখনকার অনারব্ধ রেনেসাঁসেরও নির্দেশ দেন।

মানবেন্দ্রের বিচারে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জড়বাদী দর্শনে এবং বৌদ্ধ আন্দোলনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা ও ভক্তিবাদের প্রসার সেই সম্ভাবনাকে নিরুদ্ধ করে। পশ্চিমেও খৃষ্টধর্ম বহু শতাব্দী ধরে অনুসন্ধিৎসা ও মুক্তিস্পৃহাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল; সেই জড় এবং মোহগ্রস্ত দশা থেকে ইয়োরোপের উদ্ধার ঘটে রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইসলাম অথবা ইংরেজ কোন শক্তিই সমাজ-বিপ্লবের অথবা ভাববিপ্লবের সহায়ক হয় নি। উনিশ শতকে এমনকি বিশ শতকেও ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যেমন পরমুখাপেক্ষী, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরাও তেমনি রফার বিদ্যায় পারঙ্গম। ধর্মবিশ্বাসের যে আমূল সমালোচনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম প্রাথমিক শর্ত, নগরনিবাসী ইংরেজীশিক্ষিত ভারতীয়রাও সেটিকে অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছেন এবং এখনো চলছেন। বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি নয়, ধর্মীয় ঐতিহ্যের বড়াই এখানকার শহুরে স্বাজাত্যবাদীদের প্রধান সম্বল। এই ঐতিহ্য এবং আবহাওয়া থেকে নিয়ত প্রশ্নশীল, জগৎমুখী, আত্মনির্ভর ও উদ্যোগী মনোভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার নামই রেনেসাঁস; এবং মানবেন্দ্রের যুক্তি-অনুসারে এই উত্তরণ ও সামাজিক বিপ্লব অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। রেনেসাঁসের অভাবে ভারতবর্ষের সামাজিক-রাষ্ট্রিক-আর্থিক বিকাশ এতাবৎ অবরুদ্ধ; ইংরেজশাসন শেষ হবার পরও এই বিভক্ত উপমহা-দেশে নেতাদের কার্যকলাপ থোড়-বড়ি-খাড়া থেকে খাড়া-বড়ি-থোড়ে

পর্যবসিত। যা ঘটে নি তা ঘটেছে ভেবে উল্লসিত না হয়ে এদেশে যথার্থ রেনেসাঁসের ও সমাজ বিপ্লবের প্রবর্তনে উদ্যোগী হওয়া বিবেকী মাত্রেরই দায়িত্ব—এটিই ছিল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে মানবেন্দ্রের বিশেষ আবেদন।

মানবেন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁর এই আবেদন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি; তাঁর পাঠকসংখ্যা আজও নিরতিশয় সীমাবদ্ধ। কিন্তু সম্প্রতিকালে উনিশ-শতকী ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বঙ্গদেশ, সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকের বক্তব্যের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের বেশ কিছুটা মিল চোখে পড়ে। এইসব লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ মার্ক্সপন্থী, কিন্তু সকলে নন। যেমন বি. বি. মিশ্র অথবা অনিল শীলকে কোন যুক্তিতেই মার্ক্সপন্থী বলা চলে না[৪]। কিন্তু তাঁরা আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে উনিশ শতকে উদ্ভূত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-তন্ত্রের তল্পিদার-মাত্র, পশ্চিমী অর্থে এই শ্রেণীকে যথার্থ বুর্জোয়া বলা চলে না, সম্প্রসারণশীল ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, উদ্যোগ-উদ্ভাবনা বা প্রযুক্তিবিদ্যার সাধক না হয়ে এই শ্রেণীর সদস্যরা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা এবং জাতিভেদ-নির্ভর সমাজসংগঠনের প্রকরণে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন জমিদার, নিযুক্তক, চাকুরে অথবা পেশাজীবী হিসেবে। এঁদের আর্থিক সমৃদ্ধির প্রধান, প্রায় একমাত্র উৎস, ইংরেজিশিক্ষা এবং ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা; কিন্তু অধিকাংশই এসেছেন হিন্দু সমাজের পরম্পরাস্বীকৃত উঁচুজাতের কোঠা থেকে। ফলে এঁরা রক্ষণশীল; উপযোজন এঁদের ব্রত; সামাজিক উল্লম্ব গতির অথবা মৌলিক রূপান্তরের না এঁরা প্রবর্তক, না প্রতিভূ।

ভারতীয় মধ্যবিত্ত-শ্রেণী, বিশেষ করে বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক বা বাবু সমাজের এই সমাজতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ উনিশ-শতকী রেনেসাঁসের প্রকল্পের মূলে আঘাত করে। এই প্রকল্প সম্পর্কে প্রথমে সংশয় ও দ্বিধা এবং যাঁদের এই প্রকল্পিত রেনেসাঁসের প্রতিনিধি ভাবা হ'ত তাঁদের ভূমিকার প্রতি অনেকটা অসূয়ক প্রতিন্যাস গত পনের বিশ বছরে এদেশে বেশ লক্ষণীয়ভাবে বিস্তারলাভ করেছে। অশ্রদ্ধার ভাবটি সব চাইতে উগ্ররূপে প্রকাশ পায় নক্সালপন্থীদের ক্রিয়াকলাপে, কিন্তু এই ভাবটি যে মোটেই তাঁদের ভিতরে সীমাবদ্ধ নয় সমকালীন অনেকের রচনাতেই সেটি স্পষ্ট। ভারতীয় তথা বঙ্গীয়

রেনেসাঁসের প্রকল্পকে যাঁরা পুরোপুরি অথবা অনেকটাই খারিজ করতে চান তাঁদের প্রধান যুক্তিগুলি মোটামুটি এই ধরনের :

(ক) ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস ঘটেছিল সেখানকার সমাজের আভ্যন্তরীণ কার্যকারণসূত্রে ; তার ঐতিহাসিক নায়ক ছিল বুর্জোয়া-শ্রেণী ; সামাজিক-আর্থিক-রাষ্ট্রিক বিপ্লবের সেটি ছিল সাংস্কৃতিক প্রকাশমাত্র ; এবং এই বিপ্লবের ফলে পশ্চিমের সার্বিক প্রগতি সাধিত হয়।

(খ) ভারতীয় তথা বঙ্গীয় ইতিহাসে উনিশ শতকে যা ঘটে তা হল এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ; এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের প্রয়োজনে উদ্ভূত এবং সে-হেতু উদ্যোগ ও উদ্ভাবনার সামর্থ্যে বঞ্চিত ; তাদের স্বার্থান্বেষণের সঙ্গে জনজীবনের কোন যোগ ছিল না, এবং তারা এদেশে কোন সামাজিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় নি।

(গ) সুতরাং পশ্চিমের সঙ্গে তুলনীয় কোন রেনেসাঁস এদেশে হয় নি ; যা হয়েছে তাকে বলা চলে সমাজের উপরতলার কিছু ইংরেজী শিক্ষিতের অনুচিকীর্ষু ভাববিলাস, অথবা বড়জোর আপতিক এবং নিতান্ত সীমাবদ্ধ সংস্কার প্রয়াস।

এই যুক্তিবিন্যাসের মধ্যে শুধু এদেশের উনিশ-শতকী ঘটনাবলীর একটি ব্যাখ্যা মেলে না ; এর পিছনে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে ইতিহাস সম্পর্কে এক ধরনের চিন্তার উপস্থিতিও সক্রিয়। অথচ রেনেসাঁস ও ইতিহাস-বিষয়ে এই ধারণাগুলি নিয়ে এদেশে বিশেষ আলোচনা হয় নি ; বরং সেগুলিকে অপ্রতর্ক্য বলে ধরে নিয়েই এই যুক্তিবিন্যাসকে সাধারণত উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু এই ধারণাগুলি কি সত্যই অপ্রতর্ক্য ? এগুলি কি অতিসরলীকরণের লক্ষণাক্রান্ত নয় ? আমার অনুমান রেনেসাঁসের ব্যক্তার্থ ও জাতার্থের বিবর্তন নিয়ে এবং সেই সূত্রে ইতিহাস-দর্শনের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা সূচিত হলে এদেশে উনিশ শতকে যা ঘটেছিল বা ঘটে নি তার চরিত্র নির্ণয়ে কিছুটা সাহায্য হওয়া সম্ভব।

দুই

একটি গৌরবোজ্জ্বল অতীত যুগ, তারপর একটি তমসাচ্ছন্ন বর্বর যুগ, এবং তারপর একটি পুনর্জন্ম বা পুনরুজ্জীবনের যুগ—ইতিহাসের এই

পর্ববিভাগ সেই যুগের ভাবুকদের লেখাতেই প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে যাঁরা নিজেদের কালকে রেনেসাঁস আখ্যায় অভিহিত করেন[৫]। রোমক সভ্যতার পরবর্তীকাল সম্পর্কে "অন্ধকার" (tenebrae) শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ প্রথম দেখি পেত্রার্কার (১৩০৪-১৩৭৪) রচনাবলীতে। চতুর্দশ শতকের ফ্লোরেন্সে যে শিল্প ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে তার প্রথম উল্লেখ করেন এই উজ্জীবনের অন্যতম আদি এবং প্রধান পুরুষ জ্যোভানি বোকাচ্চো (১৩১৩-১৩৭৫)। ঐ শতকের শেষ দশকে ইতিহাসের ত্রিপর্ব বিভাগ বিশেষভাবে ঘোষিত হয় ঐতিহাসিক ফিলিপো ভিলানির রচিত "ফ্লোরেন্স নগরীর বিখ্যাত নাগরিকদের বিবরণ" গ্রন্থে[৬]। পনেরো শতকে ইতালীয় ভাবুকদের মধ্যে এই ত্রিপর্ব-বিভাগ প্রায় সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করে, এবং সেখান থেকে ইয়োরোপের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের মনীষীদের মধ্যেও ছড়িয়ে যায়। লোরেনৎসো ভালা (১৪০৬-৫৭) ও মার্সিলিও ফিচিনো (১৪৩৩-১৪৯৯) তাঁদের সমকালের ফ্লোরেন্সে দীর্ঘরাত্রির অবসানে মনস্বিতার পুনরভ্যুদয় দেখে উল্লসিত হয়েছিলেন। সচেতনভাবে এঁদেরই অনুসরণ করেন এরাজমুস (১৪৬৬-১৫৩৬) ইয়োরোপে "বর্বরতা বিরোধী" (Antibarbarorum) "সৎসাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের" (Renascantur bonae literae) দাবি তুলে।

আপন যুগের বৈশিষ্ট্য ও গরিমা এবং অব্যবহিতপূর্ব যুগের সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য বিষয়ে চোদ্দ ও পনেরো শতকের অনেক ভাবুকই সচেতন ছিলেন বটে, কিন্তু রেনেসাঁসের তথ্যনির্ভর বিবরণ ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বহুল প্রচলন ঘটে জর্জো ভাসারির "চরিতাবলী" গ্রন্থের সূত্রে। ভাসারি (১৫১১-৭৪) নিজে ছিলেন শিল্পী; চিত্রকর ও স্থপতি হিসেবে তিনি স্বযুগে কম অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন নি; তবু এই একটি বইই তাঁকে অমরতা দিয়েছে। "চিমাবুয়ে থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত ইতালীয় মহৎ স্থপতি, চিত্রকর ও ভাস্করদের চরিতাবলী" (Le Vite de' piu eccellenti architetti, pittori et scultori italiani da Cimabue insino a tempi nostri) প্রকাশিত হয় ১৫৫০ সালে; প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বইটির অসামান্যতা ব্যাপক স্বীকৃতি পায়; তারপর আরো অনেক নতুন নতুন তথ্য সযত্নে সংগ্রহ করে তিনি বইটির পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ বার করেন ১৫৬৮ সালে। অনিবার্যভাবেই এই মহাকাহিনীর প্রধান

পুরুষ রূপে দেখা দিয়েছেন ভাসারির তরুণ বয়সের গুরু, প্রৌঢ় বয়সের বন্ধু, তৎকালের মহত্তম প্রতিভা মিকেলাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) কিন্তু প্রধান হলেও তিনি একক নন; তাঁর পিছনে ও পাশে যাঁরা এই কাহিনীতে উপস্থিত তাঁরাও অসামান্য সৃজনীশক্তির অধিকারী; সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে তাঁদের উপস্থিতির অনবচ্ছেদ প্রায় অবিশ্বাস্য। সিস্টিন চ্যাপেলের ফ্রেস্কোর মতোই অজস্র, অনুভাবিত, আনদ্ধ এই আলেখ্যাবলী। ভাসারি-বর্ণিত তিনশো বছরকে সংগত কারণেই যে তিনি রেনেসাঁসের যুগ বলেছেন গ্রন্থপাঠের পর সে-সম্পর্কে সংশয়মাত্র থাকে না।

"চরিতাবলী"-র তথ্যনির্ভর, ঘটনাকীর্ণ, বর্ণাঢ্য কাহিনী বিশেষ এক ইতিহাস-দর্শনের দ্বারা সংযুক্ত। ত্রিপর্ব বিভাগ প্রসঙ্গে ভাসারি বার-বার শিল্পকলার ইতিহাসকে প্রাণীদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন; তার জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তি, পূর্ণবিকাশ, জরা এবং মৃত্যু একটি জীবন-চক্র রচনা করে। গ্রেকো-রোমান সভ্যতায় তাই ঘটেছিল; অন্ধকার যুগে শিল্প-কলা জরাগ্রস্ত এবং অবশেষে মৃত; ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে শিল্প-কলার নবজন্ম সূচিত হয়। ভাসারি তাঁর বর্ণিত রেনেসাঁসকে (rinascita) তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন। প্রথম পর্যায়ে চিমাবুয়ে ও তাঁর শিষ্য জোত্তো (আঃ ১২৭৬-১৩৩৭) প্রকৃতি থেকে কল্পনার উপাদান সংগ্রহ করে চিত্রকলায় প্রাণের আত্মবিকাশ-শক্তি সঞ্চারিত করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রুনেলেশ্‌কি (১৩৭৭-১৪৪৬), দোনাতেলো (১৩৮৬-১৪৬৬), মাসাচ্চো (১৪০১-২৮?) প্রমুখ প্রতিভাধর শিল্পীরা একদিকে প্রকৃতির অনুধ্যান ও অন্যদিকে নানাবিধ প্রয়োগ-পদ্ধতির উদ্ভাবন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চর্চার দ্বারা স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় বহুমুখী সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটিত করেন।

তৃতীয় যুগে শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা সাধিত হয়। এই মহোৎকর্ষ আনেন লেওনার্দো (১৪৫২-১৫১৯), মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েলো (১৪৮৩-১৫২০), তিত্‌সিয়ানো (১৪৮৭-১৫৭৬) প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। মিকেলাঞ্জেলো ও তিত্‌সিয়ানোর সমকালীন উপস্থিতি সত্ত্বেও ভাসারি অনুভব করেছিলেন ইতালিতে রেনেসাঁসের অবসান সমাসন্ন। অনিবার্যকে তিনি অস্বীকার করেন নি। তবু তাঁর আশা ছিল যে হয়তো-বা রেনেসাঁসের স্বরূপ উপলব্ধি ও যথার্থ মূল্যায়নের দ্বারা উপক্রান্ত অবক্ষয়কে অন্তত সাময়িকভাবেও রোধ করা সম্ভব। "আমার যুগের

শিল্পীদের আমি দেখাতে চেয়েছি কেমন করে ক্ষুদ্র সূচনা থেকে মহৎ পরিণতিতে পৌঁছোন যায়, এবং সেই পরোৎকর্ষ থেকে আবার কেমন করে সমূহ বিনাশে পর্যবসান ঘটতে পারে। ....রেনেসাঁসের প্রগতির পথে শিল্পকলা যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে সেটি তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করবেন, এই ভরসাতেই আমি এই গ্রন্থ লিখেছি[১]।"

ভাসারির ইতিহাস-তত্ত্ব অনুসারে রেনেসাঁসের মূল উৎস শিল্পীদের উদ্ভাবনী-প্রতিভা। প্রতিভা শিল্পকে পুনরাবৃত্তির সম্মোহ থেকে উদ্ধার করে। একদিকে প্রকৃতির প্রাণবন্ত বিচিত্র রূপাবলীর সঙ্গে চেতনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ, অন্যদিকে প্রাচীনকালের শৈল্পিক উত্তরাধিকারের পুনরাবিষ্কার এই উদ্ভাবনী প্রতিভাকে পুষ্ট করে তোলে। প্রতিভা ছাড়া নবজন্মও যেমন অকল্পনীয়, অবক্ষয়কে ঠেকিয়ে রাখাও তেমনি অসম্ভব। প্রতিভা শিল্পীর স্বভাবধর্ম, ভাসারির এবং অন্যান্য রেনেসাঁসী ভাবুকদের ভাষায় তাঁর "ভিরতু" (Virtu) ; তবে এটির প্রবর্ধন এবং পূর্ণপ্রকাশ অনুশীলনসাপেক্ষ। একদিকে শিল্পীরা পরস্পর থেকে পুষ্টি আহরণ করেন, অপরদিকে বিদগ্ধ রসিক ব্যক্তিরা (cognoscenti) শিল্পীদের যথার্থ মূল্যায়ন ও অভ্যর্থনার দ্বারা সমাজকে শৈল্পিক রেনেসাঁসের শরিক করে তোলেন। ফলত, ভাসারির ইতিহাসতত্ত্বে মনস্বিতাই রেনেসাঁসের উৎস। প্রকৃতি ও অতীতকাল থেকে শিল্পী যেসব উপাদান ও মডেল গ্রহণ করেন তাঁর উদ্ভাবনী কল্পনা ও অনুশীলিত প্রয়োগবিদ্যা তাকে অধিকতর সৌষম্য এবং অর্থসমৃদ্ধি দান করে। রেনেসাঁসের সূত্রে সমাজ প্রাণবন্ত ও বৈভবশালী হয় ; কিন্তু তার উদ্যোক্তা, ধারক এবং বাহক হলেন শিল্পী ও রসিককুল ; সর্বসাধারণের এই ইতিহাস-রচনায় বিশেষ কোন ভূমিকা নেই।

ভাসারির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ইতালিতে, বিশেষ করে ফ্লোরেন্সে ; শিল্পকলাই ছিল একান্তভাবে তাঁর আলোচ্য বিষয়। সতেরো এবং আঠারো শতকে রেনেসাঁসের আলোচনা ভৌগোলিক ও বিষয়গত উভয় দিকেই আরো সম্প্রসারিত হয়। তার কারণ চোদ্দ থেকে ষোল শতকে ইতালিতে শিল্পের ক্ষেত্রে যে অপ্রতিহত উজ্জীবন দেখা গিয়েছিল কিছুটা তারই প্রভাবে, অনেকটা অন্যবিধ নানা ঘটনাসমাবেশের ফলে, পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারই সমরূপ প্রাণময়তার নানা লক্ষণ ক্রমে পরিব্যক্ত হয়ে ওঠে। ভাষায় ও সাহিত্যে, সংগীতে ও শিল্পকলায়, দর্শনে ও বিজ্ঞানে,

সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক সংগঠনে ষোল থেকে আঠারো শতকের মধ্যে ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক রূপান্তর কমবেশী প্রত্যক্ষ। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইয়োরোপের পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই পশ্চিমের বহু ভাবুক তাঁদের সমকালকে আধুনিক যুগ বলে অভিহিত করেন। তাঁদের বিচারে আধুনিক যুগ মধ্যযুগের সম্পূর্ণ বিপরীতগামী এবং এই যুগের উদ্ভব ঘটে রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে। সতেরো শতকের শেষ দশকে পি এর বেইল (১৬৪৭-১৭০৬)-এর বিখ্যাত "অভিধান"-এ রেনেসাঁসের যে ব্যাখ্যা মেলে পরের শতকের বেশির ভাগ চিন্তকই তার দ্বারা প্রভাবিত হন। বেইল রেনেসাঁসকে দেখেন মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মানবমনের মুক্তির আন্দোলন-রূপে। প্রাচীন গ্রীসের জিজ্ঞাসু ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠা, চার্চের প্রাধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিবেক ও যুক্তির অভ্যুত্থান, বিজ্ঞানে কোপরনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)-কেপলার (১৫৭১-১৬৩০)-গালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২)-সাধিত বিপ্লব, দর্শনে মঁতেঞ, (১৫৩৩-৯২)-বেকন (১৫৬১-১৬২৬)-দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০)-এর প্রগতিশীল সংশয়বাদ, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরোহিত-পণ্ডিতদের চাপানো মৃত লাতিনের বোঝা সরিয়ে ফেলে জীবন্ত মাতৃভাষাদের চর্চা ও বিকাশ—এইসবই বেইল-ব্যাখ্যাত রেনেসাঁসের (la renaissance des lettres) বৈশিষ্ট্য। তিনি সতেরো শতককেও রেনেসাঁসী যুগের অন্তর্ভুক্ত করেন, এবং এই যুগের প্রেরণা ও উত্তরলব্ধি ছাড়া যে আধুনিক যুগের বিকাশ অকল্পনীয় তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন।

রেনেসাঁস সম্পর্কে আঠারো শতকের যুক্তিবাদী চিন্তা মোটামুটি-ভাবে বেইল-এরই অনুসারী[৮]। যুক্তিবাদীরা শিল্পকলা বিষয়ে ভাসারির মতো ততটা আগ্রহী ছিলেন না; তাঁদের প্রধান ঝোঁক ছিল দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজচিন্তা এবং সামাজিক রূপান্তরের উপরে। বিভিন্ন সভ্যতার জন্ম-বিকাশ-মৃত্যুর প্রকল্পের পরিবর্তে তাঁরা উপস্থাপিত করেন বৈশ্বিক মানবেতিহাসে প্রগতির প্রকল্প[৯]। তাঁদের ইতিহাস-বীক্ষা ছিল সম্পূর্ণভাবে ঐহিক; মানুষ, তার সমাজ এবং প্রকৃতি-পরিবেশ—এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই ইতিহাস রচিত হয়। ইতিহাসে সমস্ত ঘটনাই কার্য কারণ নির্ভর এবং পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত; সেখানে অতিপ্রাকৃত বা আপতিকের কোন স্থান নেই। মানব-প্রজাতির কতগুলি সামান্য লক্ষণ আছে; এগুলি আছে বলেই

মানুষের বৈশ্বিক ইতিহাস সম্ভব। কিন্তু তারি সঙ্গে সঙ্গে স্থান-কাল-পাত্রের এবং ঘটনাসমাবেশের বিভিন্নতাও বর্তমান। ফলে বৈশ্বিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানবীয় অবস্থা দেখা যায়। যুক্তির দ্বারা প্রকৃতির নিয়মাবলীকে আবিষ্কার করা এবং যুক্তির নির্দেশ অনুসারে ব্যক্তিগত ও সামূহিক জীবনকে পরিচালনা করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। যখন যে-সমাজে মানুষ যুক্তিশীলতাকে জীবনের কেন্দ্রে স্থান দেয় তখন সে-সমাজে প্রকৃতি-পরিবেশ মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে, এবং এই বিকাশেরই নাম প্রগতি। রেনেসাঁসের কালে ইয়োরোপে যুক্তিশীলতা প্রধান হয়ে ওঠে এবং ফলে শুধু ইয়োরোপের বিকাশ ঘটে না, ইয়োরোপের প্রভাব ক্রমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে ঐকাহিক প্রগতি দেখা যায়; কিন্তু সেই প্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল অজ্ঞতা, ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানদের প্রতিপত্তি। ধর্মান্ধতা এবং চার্চের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে ইয়োরোপের সাংস্কৃতিক-সামাজিক জীবনে যেমন গতির সঞ্চার হয়, তেমনি ষোল, সতেরো এবং আঠারো শতকে ইয়োরোপের সম্প্রসারণশীল শক্তি সমস্ত জগৎকেই ক্রমে প্রাগতিক প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করে। যুক্তিবাদীরা মনে করতেন ইতিহাসচর্চা প্রগতির সহায়ক, কারণ ইতিহাস থেকে শেখা যায় কোন সভ্যতার প্রগতি কীভাবে রুদ্ধ হয় এবং কীভাবেই বা আবার প্রগতিশীলতার পুনরুজ্জীবন ঘটানো সম্ভব। প্রগতি অবশ্যম্ভাবী কারণ মানুষ স্বভাবত যুক্তিশীল। তবে প্রগতির পথে বাইরের ও ভিতরের বাধাও কম নয়। এইসব বাধার অপসারণে আত্মনিয়োগ মনস্বীজনের অবশ্যকর্তব্য।

এই ঐতিহাসিক প্রগতিতত্ত্বের বিভিন্ন সূত্র ভলতেয়ার, হিউম, গিবন, কঁদরসে প্রভৃতির রচনায় দেখতে পাই। ভলতেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) বিচারে মানবপ্রকৃতি মূলত সর্বত্রই এক, কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম, আচার-আচরণ, জনমত, ইত্যাদির প্রভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে ইতিহাস বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। যুক্তিশীলতার প্রতিষ্ঠা শুধু ব্যক্তি এবং সমাজের বিকাশের জন্যই জরুরী নয়, সর্বমানবীয় ঐক্য এবং প্রগতিও তার উপরে নির্ভরশীল। অপরপক্ষে অজ্ঞতা, লোভ, ভয়, ধর্মীয় সংস্কার, প্রশ্নরিক্ত বিশ্বাসের উগ্রতা প্রভৃতির ফলে বিকাশ উপসংহৃত, মানবীয় ঐক্যের দিকে

প্রগতি অভিক্রান্ত। মানুষের ইতিহাসে সভ্যতা ও বর্বরতার সংগ্রামকে উদ্ঘাটিত করে দেখানোই ঐতিহাসিকের বিশেষ দায়িত্ব ; যাঁরা মনস্বী তাঁরাই প্রগতির মুখ্য ধারক এবং ইতিহাসের প্রকৃত নায়ক। আধুনিক ইতিহাসে মনস্বিতার প্রথম অভ্যুদয় ঘটে ইতালিতে ; রেনেসাঁসের যুগেও সেখানে ধর্মান্ধ এবং অসূয়ক ব্যক্তির অপ্রতুল ছিল না বটে, কিন্তু সে যুগের ইতালিতে যেটি সব চাইতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সেটি হল একই সময়ে বহু জিজ্ঞাসু ও মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব। তারপর রেনেসাঁসী মনোভাব ইতালি থেকে ফরাসী দেশে ছড়িয়ে পড়ে, এবং বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাষ্ট্রিক রূপান্তরের ভিতর দিয়ে রেনেসাঁসী আধুনিকতা সর্বব্যাপী হয়। ভলতেয়ারের ভাষায় মানবাত্মার পুনর্জন্ম (renaissance de L'esprit humain) আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ।

বেইল-এ যে ব্যাখ্যার সূচনা তারই পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে কঁদরসের ইতিহাস-দর্শনে। ১৭৯৩ সালে রচিত "মানবমনের প্রগতির ঐতিহাসিক পরিমাপ" নিবন্ধে কঁদরসে বৈশ্বিক ইতিহাসকে দশটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন। তাঁর বিচারে সামাজিক প্রগতি নির্ভর করে জ্ঞানের প্রগতির উপরে। মধ্যযুগে অত্যাচারী চার্চ ও সমরশক্তি জ্ঞানের চর্চাকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করেছিল। ফলে ইয়োরোপীয় সমাজ জড় তমিস্রায় আচ্ছন্ন হয়। রেনেসাঁস ও তার অব্যবহিত পরবর্তী যুগে জ্ঞানচর্চা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ফলে সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে (কঁদরসের ঐতিহাসিক পরিলেখে এদুটি সপ্তম ও অষ্টম পর্যায়)। পোপদের সঙ্গে সম্রাট ও নৃপতিবর্গের সংঘর্ষ, চার্চের প্রাধিকারের উপরে বিবেকী ব্যক্তিদের আক্রমণ, ক্রুসেডের সূত্রে আরবসভ্যতার সঙ্গে ইয়োরোপের পরিচয়, ইতালিতে ও অন্যত্র স্বাধীন নগরাবলীর প্রতিষ্ঠা, বারুদ, কম্পাস এবং ছাপাখানার উদ্ভাবনা—এই-সব ঘটনাবলীর সম্মিলিত আঘাতে ইয়োরোপে ধর্মের প্রভাব শিথিল হয়ে পড়ে। সমুদ্রপথে নতুন নতুন মহাদেশের আবিষ্কার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ পুনরুজ্জীবিত জ্ঞানান্বেষার সহায়ক হয়। বেকন, গালিলিও, দেকার্ত যুক্তিকে আবার মানবজীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সেই দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ফলে বৈশ্বিক প্রগতির পথ উন্মুক্ত হয়।

আভ্যন্তরীণ বিকাশ ও বহির্বিশ্বে সম্প্রসারণ সত্ত্বেও আঠারো শতক

পর্যন্ত, ইয়োরোপ পৃথিবীর কেন্দ্র হয়ে ওঠে নি। শিল্প-বিপ্লব ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে উনিশ শতকে জগতের অন্যান্য অধিকাংশ অঞ্চল পশ্চিমের কুক্ষিগত হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "ইতিহাসের দর্শন বক্তৃতাবলী"তে হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) বিভিন্ন সভ্যতার আংশিক দানের ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিচার করে সিদ্ধান্তে আসেন যে বৈশ্বিক চেতনার পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি ঘটেছে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতায়, নব্যরাষ্ট্রের রূপে যার বাস্তবায়ন, এবং জার্মান রিফর্মেশনই যার প্রকৃত উৎস। রেনেসাঁস যে একই সঙ্গে ইয়োরোপীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগের নাম এবং সমগ্র মানবীয় ইতিহাসের সব চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই তত্ত্ব প্রবল উৎসাহে ঘোষিত হয় মিশলের "লা রেনেসাঁস" গ্রন্থে; একটি তাঁর "ফরাসীদেশের ইতিহাস" এর সপ্তম খণ্ড। মিশলের ভাষায়—ষোড়শ শতকেই মানুষ প্রথম "বহির্বিশ্বকে ও নিজের অন্তর্জগৎকে আবিষ্কার করে।" মহাপৃথিবী ও মহাকাশের উপর থেকে রহস্য যবনিকা সরিয়ে দেন কলম্বাস, কোপরনিকাস, গালিলিও; আর মানবচরিত্রের অন্তস্থল উদ্ঘাটিত করেন রাবলে, মঁতেঞ, শেক্সপীয়ার, সার্ভান্তিজ। "মানুষের অপরিমেয় ইচ্ছাশক্তির স্বতোবৃত্ত বিস্ফোরণ থেকে রেনেসাঁসের উদ্ভব[১০]।"

পূর্ববর্তী এইসব ভাবুকদের চিন্তা সংশ্লেষিত হয় ইয়াকব বুর্কহার্টের "ইতালিতে রেনেসাঁসের সভ্যতা" মহাগ্রন্থে[১১]। চোদ্দ থেকে ষোল শতকের ইতালির মানসইতিহাসের এই সুসম্বদ্ধ বিবরণে বুর্কহার্টের ইতিহাসদর্শন পরিব্যাপ্ত। বুর্কহার্টের বিচারে প্রাতিস্বিকতাই প্রগতির জনক, রেনেসাঁসের উৎস এবং আধুনিক সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ। পোপের সঙ্গে সম্রাটের সংঘাতের ফলে ইতালিতেই প্রথম আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং রাজনীতি আকার পায়। ইতিহাসে এই প্রথম রাষ্ট্র 'শিল্পকর্ম'রূপে কল্পিত হয়, রচিত হয় সচেতন প্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত সৃষ্টি হিসেবে। এই রাষ্ট্রের পরিকল্পক, নায়ক এবং সন্তান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ।

মধ্যযুগে মানুষের চেতনায় বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ আচ্ছন্ন ছিল ধর্মবিশ্বাস ও নানাবিধ অধ্যাসের আবরণে; মানুষ নিজেকে দেখত সমষ্টির অংশরূপে। রেনেসাঁসের কালে মানুষ যেমন বহির্জগৎকে তার স্বরূপে দেখতে শুরু করে, নিজের অন্তর্জগতের আবিষ্কারের ভিতর দিয়েও তেমনি সে তার স্বকীয়তার প্রতিষ্ঠায় ও বিকাশে উদ্যোগী

হয়। অতীতের পুনরাবিষ্কার রেনেসাঁসের মানুষকে পুষ্টি জুগিয়েছিল বটে, কিন্তু এই পুষ্টি সে সংগ্রহ করতে পেরেছিল আত্মপ্রত্যয়ী উদ্যোগের সামর্থ্যে। তার শিল্প-সাহিত্যে, তার দর্শন-বিজ্ঞানে, তার আবিষ্কার-উদ্ভাবনায়, তার ব্যবসা-বাণিজ্যে, ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে এই প্রাতিস্বিকতাবোধ নানারূপে প্রতিফলিত। ধর্মীয় নির্দেশের প্রাধিকারকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে রেনেসাঁসী ব্যক্তিত্ব নিজের মধ্যেই ঔচিত্য-অনৌচিত্যের নির্ণায়ক খুঁজেছিল। এই স্ব-নির্ভর অনুসন্ধান যেমন আধুনিক সভ্যতায় নৈতিক সমস্যাবলীর উৎস, তেমনি এটি ছাড়া স্বাধীন সমাজ এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রগতি অকল্পনীয়।

বুর্কহার্টের বইটি গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে রেনেসাঁস-সম্পর্কিত আলোচনাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর যুক্তির বিভিন্ন দিককে যাঁরা আরও বিশদ করেছেন অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্পূরক যুক্তির অবতারণা করেছেন তাঁদের মধ্যে আর্নস্ট্ কাসিরার, হান্স্ ব্যারন এবং আলফ্রেড ফন্ মার্টিন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মানুষই যে ইতিহাসের, নিজের চরিত্রের এবং স্ব-ভাগ্যের রচয়িতা—রেনেসাঁসী জীবনদর্শনের এই দিকটি নিয়ে সবচাইতে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন কাসিরার[১২]। রেনেসাঁস ও মধ্যযুগের বৈপরীত্য এবং রেনে-সাঁসের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ে প্রচুর লিখেছেন ঐতিহাসিক হান্স্ ব্যারন[১৩]। বুর্জোয়া শ্রেণীই যে রেনেসাঁস এবং আধুনিক যুগের প্রবর্তক এই প্রকল্প বিশদভাবে উপস্থাপিত করেন সমাজতাত্ত্বিক মার্টিন। মার্টিন বুর্কহার্টীয় ব্যাখ্যার যাথার্থ্য মোটামুটি-ভাবে মেনে নিয়েও "রেনেসাঁসের সমাজতত্ত্ব" গ্রন্থে জোর দিয়েছেন মানসিক রূপান্তরের আর্থিক ভিত্তির উপরে[১৪]। তাঁর বিচারে প্রতি-যুগের বিশিষ্ট ভাববিন্যাস সেই যুগের প্রধান শক্তিশালী বা মাতব্বর-শ্রেণীর সামূহিক স্বার্থের প্রকাশমাত্র। মধ্যযুগীয় সমাজে জমি ছিল সম্পদের উৎস এবং জমির উপর অধিকার ছিল ক্ষমতার উৎস। রেনেসাঁসের যুগে উদ্যোগী বণিক ব্যবসায়ীদের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার ফলে আর্থিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে, শক্তির কেন্দ্র গ্রাম থেকে নগরে সরে আসে, এবং এই বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনির্ভর, বাস্তববাদী, যুক্তি-শীল ও উদ্যোগী ক্রিয়াকলাপ রেনেসাঁসী ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতিতে প্রতি-ফলিত হয়। মার্টিনের এই ব্যাখ্যার উপরে মার্ক্সীয় চিন্তার প্রভাব স্পষ্ট ;

তবে তা ছাড়াও তিনি হ্বেবার, সোম্বার্ট, সিমেল ও মানহাইমের কাছে ঋণের কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি কিন্তু যথেষ্ট তথ্যাদি উপস্থিত করেন নি। প্রকৃতপক্ষে মার্টিনের প্রকল্পকে হ্বেবার অথবা সোম্বার্টের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দাঁড় করানো যায় না। হ্বেবার রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতিফলন হিসেবে দেখেন নি ; তাঁর বিচার-অনুসারে ধনতান্ত্রিক বিকাশের অন্যতম প্রধান উৎস প্রোটেস্ট্যান্ট নৈতিকতা[১৫]। সোম্বার্টও জোর দিয়েছিলেন বুর্জোয়া মানসের উপরে ; এই মানস নৈর্ব্যক্তিক, হিসেবী, সঞ্চয়ী, বস্তুবাদী ইত্যাদি ; এরি তাগিদে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়। তিনি এর উৎস খুঁজেছিলেন ইহুদি ঐতিহ্যে।[১৬] কিন্তু মার্টিন ছাড়াও আরও অনেকে রেনেসাঁসের উৎস খুঁজেছেন ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের ভিতরে। প্রাতিস্বিকতাই যে রেনেসাঁসের বিশিষ্ট লক্ষণ এবং রেনেসাঁসই যে মানবীয় ইতিহাসকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ করে এই বুর্কহার্টিয় প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়েই তাঁরা পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশকে রেনেসাঁসের কারণ বলে দাবি করেছেন। ভাসারি থেকে বুর্কহার্ট ও কাসিরার পর্যন্ত ইতিহাস-ব্যাখ্যাতারা জোর দিয়েছিলেন মনস্বিতার ভূমিকা এবং শিল্পে-সাহিত্যে-দর্শনে তার প্রকাশের উপরে। অপরপক্ষের যুক্তি-অনুসারে পশ্চিম ইয়োরোপের আর্থিক রূপান্তর ও বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্যোগ-উদ্যমই রেনেসাঁসী সংস্কৃতির আদি কারণ, প্রকৃত ধারক ও বাস্তব ভিত্তি।

তিন

রেনেসাঁসের এইসব ব্যাখ্যা কিন্তু অনেকের কাছ থেকে সমর্থন পায় নি, এবং এই সমালোচকরা সংখ্যায় অথবা সামর্থ্যে মোটেই নগণ্য নন। রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা নানাবিধ আপত্তি তুলেছেন। এই বিতর্ক এখনো পর্যন্ত অত্যন্ত প্রবল, এবং কোন সর্ববাদিসম্মত ইতিহাসব্যাখ্যার সম্ভাবনা দেখি না। সমালোচকদের কয়েকটি প্রধান যুক্তির উল্লেখ করা সংগত মনে করি। তাঁদের নিজেদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই মতের মিল নেই, কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলি সম্পর্কে তারা সকলেই কমবেশী সংশয়ী।

প্রথম আপত্তি রেনেসাঁসের সময়সীমা নির্ণয় নিয়ে। পূর্বে যাঁদের কথা বলেছি তাঁরা প্রায় সকলেই চোদ্দ থেকে ষোল শতককে রেনে-

সাঁসের কাল হিসেবে ধরেছেন এবং একদিকে রেনেসাঁসের সঙ্গে মধ্য-যুগের আমূল বৈপরীত্য ও অন্যদিকে রেনেসাঁসের কালে আধুনিকতার উদ্ভব ও বিকাশের উপরে জোর দিয়েছেন। সমালোচকদের মতে ঐ তিন শতকের মধ্যে এমন কিছু ঘটে নি যা মধ্যযুগ থেকে অসম্বদ্ধ বা আধুনিক যুগের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ। চালর্স হ্যাসকিন্‌স্-এর যুক্তি-অনুসারে তথাকথিত মধ্যযুগেও প্রাণচাঞ্চল্য ও পরিবর্তন, রূপসৃষ্টি ও জ্ঞানান্বেষণ প্রবলভাবেই উপস্থিত; রেনেসাঁস শব্দটি যদি আদৌ ব্যবহার করতেই হয় পনেরো শতকের তুলনায় বারো শতকের দাবি অগ্রগণ্য; তবে শব্দটি ব্যবহার না করাই সংগত, কারণ ইয়োরোপীয় ইতিহাসে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ প্রকৃতপক্ষে অনবচ্ছেদের দ্বারা চিহ্নিত। ওয়াল্‌শ্-এর মতে তেরো শতকেই যথার্থ রেনেসাঁস ঘটে। রেনেসাঁসের মধ্যে নানা স্ববিরোধের উল্লেখ করে ডগলাস বুশ দেখাতে চেয়েছেন যে রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রে যা স্থায়ী ও মূল্যবান মধ্যযুগেই তার উপস্থিতি দেখা যায়। প্রচুর তথ্য সমাবেশ করে থর্নডাইক সিদ্ধান্তে আসেন যে মধ্যযুগের তুলনায় যেহেতু চোদ্দ ও পনেরো শতকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের চর্চা দুর্বলতর সেহেতু ঐ দুই শতককে রেনেসাঁসের কাল বলা অর্থহীন। সার্টন-ও তাঁর প্রথমদিকের রচনায় এই যুক্তি সমর্থন করেন। তবে পরবর্তীকালে তাঁর সিদ্ধান্তে বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়। ডাচ্ ঐতিহাসিক হাইজিন্‌গা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে চোদ্দ বা পনেরো শতককে মধ্যযুগের অবসানকাল আখ্যা দিয়েছেন।[১৭] তাছাড়া বেশ কয়েকজন ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলেছেন বুকহার্ট-বর্ণিত যুগকে কেন আধুনিকতার প্রবর্তক বলা হবে যখন বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, জাতীয় রাষ্ট্র ইত্যাদি আধুনিক ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে সতেরো বা আঠারো শতকেই ইয়োরোপে প্রথম ব্যাপক-ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তেরো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত রেনে-সাঁসের সময়সীমাকে প্রসারিত করলে বুর্কহার্টিয় প্রকল্পের কি আর বিশেষ সার্থকতা থাকে?

দ্বিতীয় বিতর্ক রেনেসাঁসের উৎস অথবা কারণ সম্পর্কে। সচরাচর ধরে নেওয়া হয়ে থাকে রেনেসাঁসের প্রেরণা ইয়োরোপের ভিতর থেকেই এসেছিল। কনস্টান্টিনোপ্‌লের পতনের (১৪৫৩) পর গ্রীক উদ্বাস্তুদের সূত্রে ইতালিতে প্রাচীন গ্রীক ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার ঘটে; ইতালি থেকে পুনরুজ্জীবনের ঢেউ সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

এই প্রচলিত ব্যাখ্যায় পশ্চিমী রেনেসাঁসে প্রাচ্যের ভূমিকা অনুল্লেখিত। কিন্তু হিটি, ডানলপ, ওয়াট, নাস্‌র্‌, ল্যাপিডাস, হুরানি, স্টর্ন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে জানা যায় অন্ধকার যুগ থেকে ইয়োরোপের উদ্ধারে আরবসভ্যতার দান যেমন বহুমুখী তেমনি গভীর[১৮]। আরবরাই প্রথম নিজেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে একদিকে সদ্যোদ্ভূত ইসলামধর্ম ও অন্যদিকে গ্রীক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটানোয় উদ্যোগী হন, এবং সেই প্রচেষ্টা থেকে এক মহৎ ও ব্যাপক সভ্যতা গড়ে ওঠে। তৃতীয় অব্‌দল রহমানের রাজত্বকালে (৯১২-৯৬১) আরবশাসিত স্পেন ছিল ইয়োরোপের প্রধান সভ্য অঞ্চল। তাঁর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজধানী কর্ডোভা হয়ে দাঁড়ায় তৎকালীন পশ্চিমের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী। লক্ষাধিক গৃহ, বাঁধানো আলোকিত পথঘাট, জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগারে সংগৃহীত চার লক্ষের বেশি পাণ্ডুলিপি, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি—বহু দিক থেকেই আরবশাসিত স্পেন পরবর্তীকালের ইয়োরোপের মডেল বলা চলে। ইয়োরোপে আরবরাই আমদানি করেন ভারতের বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ব ও শূন্যের পরিকল্পনা এবং চীনের কাগজনির্মাণের পদ্ধতি। তুলনামূলক ধর্মবিচারের প্রবর্তন করেন আলি ইব্‌ন্ হাজ্‌ম্; ইব্‌ন্ সিনার বিখ্যাত "বিশ্বকোষ"-এর পনেরোটি লাতিন সংস্করণ প্রকাশিত হয় পনেরো শতকের শেষ তিরিশ বছরে; ইব্‌ন্-রুশ্‌দ্-এর আরিস্টট্‌ল্ ব্যাখ্যা ও যুক্তিবাদ ইয়োরোপীয় চিন্তায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে; টিউনিসের বহুবিদ্য প্রতিভা ইব্‌ন্ খাল্‌দুন তাঁর মহাগ্রন্থ "মুকাদ্দিমা"-য় যে সমাজ-তাত্ত্বিক ইতিহাস-দর্শনের পরিলেখ রচনা করেন তার মৌলিকতা ও আধুনিকতা বিস্ময়কর। দক্ষিণ ইয়োরোপের অনেকাংশ এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল দীর্ঘকাল আরবদের অধীন ছিল; হিটির মতে আরব-সভ্যতার নিষেক ছাড়া পশ্চিমী রেনেসাঁস অকল্পনীয়।

আরব প্রভাবের কথা বাদ দিলেও অন্য আরো প্রশ্ন থাকে। রেনেসাঁস প্রসঙ্গে ইয়োরোপের যে স্বকীয় ঐতিহ্যের পুনরভ্যুত্থানের কথা বলা হয় সেটি কোন্ ঐতিহ্য? রোমক-সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম ইয়োরোপের সঙ্গে গ্রীক ঐতিহ্যের দীর্ঘকাল কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। সেই হিসেবে পুনরাবিষ্কৃত গ্রীক সংস্কৃতি কি পশ্চিম ইয়োরোপে প্রকৃতপক্ষে বহিরাগত নয়? কিছু ঐতিহাসিকের মতে কনস্টান্টিনোপ্‌ল থেকে আগত শরণার্থীরা ইতালীয় রেনেসাঁসে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ

করেন নি। ভেন্‌চুরি দেখাবার চেষ্টা করেন যে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতির প্রভাব রেনেসাঁসকে প্রকৃতপক্ষে ব্যাহতই করে; তাঁর বিচার-অনুসারে ইতালির জনসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের সূত্রেই সেখানে শিল্প-সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে। থোডা দাবি করেন ইতালির রেনেসাঁসের প্রকৃত উৎস সন্ত ফ্রান্সিস ও তাঁর আন্দোলন; একই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন গেবার্ট। রসি, রুজ্জেরো প্রমুখেরও বিশ্বাস যে হেলেনিক সূত্র থেকে নয়, ইতালির স্বাজাতিক ঐতিহ্যের বিবর্তনের প্রকাশই রেনেসাঁস[১৯]। কিছু ঐতিহাসিকের মতে রেনেসাঁস একান্তভাবেই ইতালীয় ব্যাপার; অনিতালীয় সূত্র থেকে ইতালীয় রেনেসাঁস কিছুই লাভ করে নি।

স্বাজাতিকতার উপরে জোর দিলে ইয়োরোপীয় ঐতিহ্য ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়। রোম্যান্টিক আন্দোলনের সময়ে ইতিহাসে জাতিসত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন হের্ডার। মাদাম দ্য স্তাএল লেখেন যে উত্তর ও দক্ষিণ, জার্মান ও লাতিন, ক্রিশ্চান ও পেগানের ঐতিহ্য আমূল পরস্পর-বিরোধী; উত্তর-জার্মান-ক্রিশ্চান ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাই আধুনিক ইয়োরোপের বিকাশের প্রকৃত উৎস। উনিশ শতকের শেষ দশকে কুরাজো ঘোষণা করেন যে রেনেসাঁসী প্রকৃতি-তন্ত্র উত্তর ফ্রান্সের বৈশিষ্ট্য; সেখান থেকেই তা পরে ইতালিতে প্রসার লাভ করে। তিরিশ বছর পরে আরেকটু ঔদার্য দেখিয়ে হেন্‌ডেকা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে ফরাসী-জার্মান-ডাচ বিবেকিতা থেকেই রেনেসাঁসের উদ্ভব; এই "গথিক" ঐতিহ্যের প্রভাবেই ইতালির পুনর্জন্ম ঘটে। কার্ল নয়মান গ্রীক-ইতালীয় ঐতিহ্যকে সরাসরি "বিদেশী" আখ্যা দেন; তাঁর মতে নর্ডিক আত্মা ও খৃষ্টধর্মের মিলন থেকেই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনার উদ্ভব, এবং তারি সংস্রবে আসার ফলেই ইতালির জাগরণ সম্ভব হয়[২০]। ফলত অধিকাংশ জার্মান ঐতিহাসিক জোর দিয়ে থাকেন ইয়োরোপের টিউটনিক-নর্ডিক ঐতিহ্যের উপরে; তারি পুনরুজ্জীবনের সূত্রেই উত্তর ও পশ্চিম ইয়োরোপের রেনেসাঁস সাধিত হয় বলে তাঁদের ধারণা।

ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে রেনেসাঁসের কারণিক ও অনুবর্তী সম্পর্ক-বিষয়ে যে প্রকল্পটি সম্প্রতিকালে আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবী-মহলে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে সেটিকেও পশ্চিমের বেশ-কিছু ঐতিহাসিক অসংগত বিবেচনা করেন। প্রচুর তথ্য ও যুক্তি দিয়ে কনরাড বুর্ডাখ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে বুর্জোয়াশ্রেণী ও ধনতন্ত্রের

উদ্ভব রেনেসাঁসের কারণ তো নয়ই ; উপরন্তু এই দুই ব্যাপারের মধ্যে কোন সম্পর্কও দেখা যায় না। তাঁর বিচারে রেনেসাঁস মুখ্যত আত্মিক বিকাশের ফল ; সৌন্দর্যচেতনা, মনস্বিতা ও নীতিজিজ্ঞাসা থেকেই এই আন্দোলনের উদ্ভব এবং এইসব ক্ষেত্রেই তার যথার্থ প্রকাশ ঘটে[২১]। বার্বাগালো, লাবাণ্ডে ও লোপেজের গবেষণা অনুসারে বারো শতকে যেমন ইয়োরোপের আর্থিক উন্নতি দেখা যায় চোদ্দ ও পনের শতকে তেমনি আর্থিক অবক্ষয় ও মন্দার লক্ষণ সুস্পষ্ট। যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী, জনসংখ্যাহ্রাস, একই সঙ্গে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি, নাগরিক স্ব-শাসনের উচ্ছেদ, স্থলপথে যাতায়াত-ব্যবস্থার ভাঙন—এ-সবই ঘটে রেনেসাঁসের কালে। চোদ্দ শতকে ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ছিল সাঁইত্রিশ লক্ষ, পনের শতকে দাঁড়ায় একুশ লক্ষে। দান্তের সময়ে ফ্লোরেন্সের অধিবাসী ছিল এক লক্ষ, মিকেলাঞ্জেলোর সময়ে সত্তর হাজার। চোদ্দ শতকের গোড়ার দিকে সেখানকার তাঁতীদের বাৎসরিক উৎপন্ন আশি হাজার বস্ত্রখণ্ড পঞ্চাশ বছর পরে চব্বিশ হাজার বস্ত্রখণ্ডেরও নীচে নেমে আসে। তেরো শতকের শেষে জেনোয়ার বাৎসরিক আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ছিল আটত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড ; পনের শতকের গোড়ায় তা পড়ে দাঁড়ায় নয় লক্ষ পাউণ্ডে। ইংল্যাণ্ডে বুর্জোয়াদের প্রাধান্য ঘটতে শুরু করে সতেরো শতকে। ইতালিতে রেনেসাঁসের কালে তার সমতুল্য কিছু ঘটে নি ; বরং সতেরো শতক থেকে ইতালির সর্বাঙ্গীণ দুরবস্থা দেখা দেয়। লোপেজ এইসব ঘটনার বিবেচনা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও একটিকে অন্যটির কারণ মনে করার স্বপক্ষে ইতিহাসের সমর্থন মেলে না। "মানসিক বিকাশের সূত্র মানসিক ঘটনাবলীর মধ্যে খোঁজাই সংগত"[২২]।

রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও মূল্যায়ন নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। স্বাজাতিকতা ও তারি ভিত্তিতে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রথমে ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে দেখা যায় ; অপর পক্ষে জার্মানিতে ও ইতালিতে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে অনেক পরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। উদারতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার মুখ্যত উনিশ-শতকের বৈশিষ্ট্য। ম্যাক্ইলওয়েন প্রমুখ কোন কোন ঐতিহাসিক দাবি করেন যে স্বৈরাচারের বিকল্পরূপে আইনের শাসন আদর্শ-হিসেবে প্রথম ঘোষিত হয় মধ্যযুগে ; রেনেসাঁসের কালে বরং স্বৈরাচারের

সমর্থনই বেশি ব্যাপক। ধর্মবিশ্বাস থেকে রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রীরা যে মুক্ত ছিলেন অধিকাংশ ক্যাথলিক ঐতিহাসিক এ-প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন না। তাঁদের মতে ধর্মবিমুখতা প্রসারলাভ করে আঠারো শতকে। রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রীদের চিন্তায় ঐহিক প্রতিন্যাস প্রবল বটে, কিন্তু ধর্মীয় প্রত্যয়কে বর্জন করে প্রকৃতিবাদ ও যুক্তিবাদের সুস্পষ্ট প্রবক্তারা তৎকালে বস্তুতই সংখ্যাল্প। শেষোক্তদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য পিএত্রো পম্পনাৎজি (১৪৬২-১৫২৪) ও জাকোমো জাবারেলা (১৫৩২-৮৯) ; এঁদের চিন্তার সঙ্গে পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক মানবতন্ত্রের বিশেষ মিল আছে[২৩]। কিন্তু রেনেসাঁসের কালে এঁদের প্রভাব সীমাবদ্ধ।

রেনেসাঁসের সঙ্গে রেফর্মেশ্যনের সম্পর্ক আরেকটি বহু-বিতর্কিত বিষয়। অধিকাংশ ইংরেজ ঐতিহাসিক মনে করেন দ্বিতীয়টি প্রথমটির পূরক ; এবং যেসব শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজদের ব্যাখ্যার সূত্রে ইয়োরোপীয় ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত তাঁদেব ধারণা এই সিদ্ধান্ত অপ্রতর্ক্য। কিন্তু গোয়েটে লুথারীয় আন্দোলনকে রেনেসাঁসের পরিপন্থী বিবেচনা করতেন। ঐতিহাসিক আর্নস্ট্ ট্রোএল্শ্ বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখান রেনেসাঁস ও রেফর্মেশ্যনের আদর্শ ও প্রভাব পরস্পরবিরোধী[২৪]। রেনেসাঁসের প্রাতিস্বিকতা, ঐহিকতা ও জিজ্ঞাসু প্রতিন্যাস মননের স্বতঃসিদ্ধ মূল্য ও স্বশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে। তবে রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রীরা চার্চ ও শাসকশক্তির পৃষ্ঠপোষণার উপরে নির্ভর করতেন বলে তাঁদের প্রভাব আপন যুগে নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। আঠারো শতকে তাঁদের জীবনদর্শনের ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগের ফলেই আধুনিকতা বিজয়ী হয়। অপরপক্ষে রেফর্মেশ্যনের আদর্শ ছিল ইহবিমুখ, যুক্তিবিরোধী, নিগ্রহপন্থী, প্রাধিকারনির্ভর, ধর্মকেন্দ্রিক। রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে যে-মুক্তির সম্ভাবনা সূচিত হয় রেফর্মেশ্যন তাকে নিরুদ্ধ করে। ফলে পশ্চিম ইয়োরোপের সম্ভাব্য বিকাশ দুশো বছর পিছিয়ে যায়। মানুষের আদিম পাপ ও অনতিক্রম্য দুর্বলতার প্রকল্পই লুথারীয় সংস্কার-আন্দোলনের মূল সূত্র। ট্রোএল্শ্ ও তাঁর বেশ-কিছু অনুগামী চিন্তক আধুনিক স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার পূর্বাভাস দেখেছেন লুথারের চিন্তায়। অপরপক্ষে ডিল্‌থে রেনেসাঁস ও রেফর্মেশ্যনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন পশ্চিমের মানসিক মুক্তির দুটি পরস্পর-পরিপূরক দিক হিসেবে ; এবং হেবার প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের ভিতরেই ধনতন্ত্রের সূত্র নির্দেশ করেন[২৫]।

রেনেসাঁসের মূল্যায়নে যুক্তিবাদী ও ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে অসেতু-সম্ভব বিরোধ স্বাভাবিক। কিন্তু রেনেসাঁসী শিল্পকলার অসেচনক সৌন্দর্যসম্পদ সম্বন্ধেও বর্তমান শতকে কলারসিকদের মধ্যে প্রবল সংশয় উচ্চারিত। ক্লাইভ বেল-এর বিচারে বৈজান্তীয় শিল্পেই বিশুদ্ধ শিল্পরূপের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়; জোত্তোর পরে রেনেসাঁসের যুগে এই বিশুদ্ধতার বিনাশ ঘটে; বস্তুরূপের অনুকরণ ও প্রয়োগপদ্ধতির উপরচালাকি রেনেসাঁসী ও পরবর্তী শিল্পকলাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। আধুনিক শিল্পী ও শিল্পসমালোচকদের মধ্যে অনেকেই রেনেসাঁসী শিল্প-ঐতিহ্যের প্রতি বিমুখ; তাঁরা আদিম, বৈজান্তীয়, গথিক ও বারোক শিল্পজগতের সঙ্গে গভীরতর আত্মীয়তা অনুভব করেন। তাছাড়া যাঁদের বিবেচনায় পশ্চিমের সম্প্রসারণ বিবিধ অমঙ্গলের উৎস তাঁরা আপন-আপন নির্ণায়ক প্রয়োগের দ্বারা রেনেসাঁসী উত্তরলব্ধির অবসারে প্রবৃত্ত।

চার

রেনেসাঁস সম্পর্কে বিচার-বিতর্কের এই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেও হয়তো এটুকু অন্তত স্পষ্ট যে শিক্ষিত ভারতীয় মনে পশ্চিমী রেনেসাঁস বিষয়ে যে সরল ধারণাটি পরিব্যাপ্ত সেটি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। এই বিতর্কের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে যেসব তাত্ত্বিক প্রশ্ন প্রবলতর হয় তাদের মধ্যে কয়েকটিকে পেশ করা যাক।

প্রকৃতির মতো মানবেতিহাসেও কার্যকারণ সক্রিয় বটে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে কার্যকারণনির্ভর ব্যাখ্যা কি অনেক বেশি উন্মুক্ত নয়? কোন গবেষণাগারে মানবীয় ঘটনাসমুচ্চয়ের পুনঃপুনঃ সম্পাদন তো অসাধ্য বটেই; তার চাইতেও বড় কথা, মানুষের আস্তিত্বিক স্বাধীনতা ও উদ্ভাবনা শক্তি কি তার প্রতিক্রিয়াতে বিকল্পের নির্বন্ধ নিয়ত উপস্থিত রাখে না? মানুষের ক্ষেত্রেও পরিবেশের প্রভাব প্রবল ও ব্যাপক বটে; কিন্তু পরিবর্তন কি শুধু পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় অথবা ব্যক্তির অস্তিত্বগত বোধবুদ্ধি, কল্পনা, ইচ্ছা, উদ্যম পরিবর্তনের একটি প্রধান উৎস?

ব্যক্তির মতো সমাজেরও বিচিত্র দিক আছে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অস্তিত্ব ধরে না নিলে ইতিহাসের অথবা সমাজের কোনবিধ ব্যাখ্যাই অসম্ভব। কিন্তু এইসব সম্পর্ক কি এক-

মুখী কিংবা কোন নিত্য সংযুক্তিতে বিধৃত ? সব স্থানকাল পাত্রেই কি এইসব উপাদানের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট ধরনের পারম্পর্য বিদ্যমান ? এদের মধ্যে সর্বদাই কোন কোনটিকে কি ভিত্তি বা কারণ এবং কোন কোনটিকে কি উপরিস্থ বা ফল বলা চলে ? অথবা ভিন্ন ভিন্ন অনুষঙ্গে এদের ভূমিকাব আপেক্ষিক প্রাধান্য বাড়ে কমে, পারম্পর্যে পরিবর্তন ঘটে ?

ব্যক্তির ও সমাজের বিভিন্ন দিকের পরিবর্তন অথবা বিকাশ কি সর্বদাই একই সঙ্গে বা সমানভাবে ঘটে ? সৌন্দর্যবোধ ও রূপসৃষ্টি, জ্ঞানান্বেষণ ও বিজ্ঞান, বিবেক ও নীতিনিয়ম, সমাজগঠন ও রাষ্ট্র, প্রয়োগবিদ্যা ও আর্থিক সম্পর্কবিন্যাস—এইসব বিভিন্ন দিক পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হলেও এদের প্রত্যেকেরই কি স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই ? সেই ইতিহাসের মুখ্যত স্বশাসিত ব্যাখ্যা কি অসংগত ? একটির বিকাশ অন্যগুলির বিকাশে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু একদিকের স্ফূর্তির পাশে অন্যদিকের অবসন্নতা কি অনেকসময়েই চোখে পড়ে না ?

এই বিভিন্ন দিকের মূল্যায়ন কি কোন একটিমাত্র নির্দিষ্ট-সূত্রের উপরে নির্ভর করে ? বিভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠী, শ্রেণী, বিভিন্ন যুগের স্বকীয় মূল্যমান ছাড়াও বিভিন্ন দিকের চর্চার ফলে এইসব ক্ষেত্রের বিচারের উপযোগী বিবিধ নির্ণায়ক কি গড়ে ওঠে না ? যে-নির্ণায়কের সাহায্যে আমরা প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিকাশ নির্ণয় করি সেটি কি চিত্র-কলা অথবা সংগীতের বিচারে প্রযোজ্য ? নীতিবোধের মাপকাঠি কি রসায়নের মূল্যবিচারে অবান্তর নয় ? উনিশ-শতকী রুশ সাহিত্যের মহত্ত্ব কি তৎকালীন রুশদেশের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক দুর্দশার অনুষঙ্গে খর্বিত হয় ?

রেনেসাঁস কি সর্বোদয়ের সমার্থক ? অথবা রেনেসাঁস কি ফরাসী-বিপ্লব বা শিল্পবিপ্লবের মতো একটি নাটকীয় ঘটনাসমুচ্চয় যার ফলে সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে কোন সমাজের আমূল সাংগঠনিক (রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক) রূপান্তর সাধিত হয় ? অথবা, কোন সমাজের যুগব্যাপী জাড্য ও পুনরাবৃত্তির প্রভাব কাটিয়ে লক্ষণীয়-সংখ্যক ব্যক্তি যদি মনস্বিতার কয়েকটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনা, জিজ্ঞাসা ও কল্পনাকে উজ্জীবিত করেন তাহলে কি সেই ঐতিহাসিক সংঘটনকে রেনেসাঁস বলা চলে না ? তাঁদের সেই ক্রিয়াকলাপে জনসাধারণের যোগ অথবা সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন না ঘটলে সেই উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী না

হতে পারে, কিন্তু সেই কারণে সেইসব ক্রিয়াকলাপের মূল্য অথবা অর্থ কি এমনভাবে হ্রাস পায় যে তাদের সম্পর্কে রেনেসাঁস শব্দের প্রয়োগ অসংগত? লেওনার্দো অথবা রবীন্দ্রনাথ কেউই আপন সমাজের নৈতিক-আর্থিক-রাষ্ট্রিক দুর্দশা ঘোচাতে পারেন নি। কিন্তু লেওনার্দোকে যদি ইতালীয় রেনেসাঁসের মহাশিল্পী বলা হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথকে অন্তত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মহাশিল্পী কেন বলা হবে না? মিকেলাঞ্জেলোর সমকালে ইতালির বিভিন্ন অঞ্চল ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়, চার্চের দুষ্কৃতি চরমে ওঠে; কিন্তু সিস্টিন চ্যাপেল ও স্যান-লোরেন্জোর বিস্ময় কি আজও সমুজ্জ্বল নয়?

রেনেসাঁস যদি বিশেষ দেশকালে যুগব্যাপী জড়তা ও উদ্ভাবনা-হীনতার প্রভাব কাটিয়ে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন কিছু ব্যক্তির আত্ম-প্রকাশধর্মী সার্থক প্রয়াসের একটি সাধারণ নাম হয় তাহলে সেই সাংস্কৃতিক উদ্যম-উদ্যোগে প্রধান ভূমিকা কি বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর অথবা শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানে উদ্ভাবনাশীল মনস্বী-গোষ্ঠীর? শিল্পী ও ভাবুকদের বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে একীভূত করার দ্বারা কি ইতিহাসের ব্যাখ্যা অধিকতর বাস্তবানুগ হয়ে ওঠে, অথবা ঘটনা-সংস্কৃতির অর্থোপপত্তিই প্রকৃতপক্ষে ব্যাহত হয়?

কোন সমাজের রূপান্তর কি সবসময়ে বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুখ্যত আভ্যন্তরিক ঐতিহ্য ও ঘটনাক্রমের দ্বারাই সূচিত ও পরিচালিত হয়? অথবা বহিরাগত প্রভাব ও শক্তির আঘাত বহুক্ষেত্রে নির্জীব সমাজে গতি সঞ্চার করে? প্রবল আঘাতের ফলে কোন কোন সমাজ-সংস্কৃতি যেমন ধ্বংস হতে পারে তেমনি আঘাতে সাড়া দেবার সামর্থ্যসম্পন্ন কিছু মনস্বী মানুষ থাকলে সেই আঘাত কি পুনরুজ্জীবনের সহায়ক হয় না? তাছাড়া আদিজাতিদের বাদ দিলে কোন সমাজের ঐতিহ্যই কি সমসত্ত্ব? ঐতিহ্যের বিভিন্ন এবং বহুক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী উপা-দানের ভিতর থেকে বাছাই করা কি পুনরুজ্জীবনের একটি লক্ষণ নয়? এবং বহিরাগত শক্তির আঘাত ও প্রভাব ঐতিহ্যের পুনর্বিচার ও উপাদানের নির্বাচনকে কি জরুরী করে তোলে না[২৬]?

পাঁচ

প্রায় বছর তিরিশ আগে রেনেসাঁস সম্পর্কে যখন বাংলায় প্রথম একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি তখন এইসব প্রশ্ন আমার মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সেই প্রবন্ধটি আমার 'সাহিত্যচিন্তা' (১৯৫৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপরও এই বিষয়টি নিয়ে কয়েকবার লিখেছি, এবং সামর্থ্যে কুলোলে এ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখবার পরিকল্পনা আছে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আলোচনার সূত্রে প্রশ্নগুলি ক্রমে আকার নিতে থাকে। প্রশ্নগুলি শুধু রেনেসাঁস-সংক্রান্ত নয়, ইতিহাসতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব বিষয়কও বটে। প্রশ্নগুলি এবং তাদের সম্ভাব্য উত্তর নিয়ে বিশদ আলোচনা পরিকল্পিত বইটির জন্য রেখে এ-সম্পর্কে আমার কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ধারণা তিনটি শিরোনামে এখানে উপস্থিত করছি।

ক। ব্যক্তি, সমাজ ও অসমসত্ত্বতা

প্রত্যেক ব্যক্তিই অনন্য, বহুবেধ, পরিবর্তনশীল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার কায়িক ও চেতনিক ঐক্য এবং অনবচ্ছেদ নানা বৃত্তি-অভিজ্ঞতা-প্রবণতা-প্রভাবের দ্বারা চিহ্নিত। প্রায়োগিক প্রয়োজনে তার উপরে বিভিন্ন জাতিগত অভিধা চাপানো হয় বটে, কিন্তু কোন বিশেষ অভিধার কাঠামোতেই কোন ব্যক্তিকে ধরা যায় না। অনেক ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। সমাজকে বাদ দিয়েও ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনীয় (যদিও ব্যক্তির বিকাশ কল্পনীয় নয়), কিন্তু ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ অসম্ভব। সমাজমাত্রেই অসমসত্ত্ব ; তবে আদিম সমাজের চাইতে নগরকেন্দ্রিক সমাজের অসমসত্ত্বতা অনেক বেশি।

ব্যক্তিকে বোঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করেন নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লিখিয়ে ; আর অনেক ব্যক্তিকে নিয়ে যে সমূহ তার রীতি-নীতি, চরিত্র, আচরণ, গতিবিধি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন সমাজতাত্ত্বিক। সমাজতাত্ত্বিকের আভিমুখ্য হল ব্যক্তির বহুবেধ প্রাতি-স্বিকতাকে যতটা সম্ভব কম স্বীকৃতি বা মূল্য দিয়ে সামূহিক এবং সাম্পর্কিক অভিধা ও প্রক্রিয়াপদ্ধতিকে প্রধান করে তোলার দিকে। এখন একথা ঠিকই যে যখন অনেক স্ত্রীপুরুষ একই সন্নিবেশে ও অঞ্চলে কয়েক পুরুষ ধরে বাস করেন তখন তাঁদের মধ্যে নানা স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে, নানা সামান্য লক্ষণ দেখা দেয়, সহযোগ-সংঘাতের ভিতর দিয়ে নানা প্রবণতা ও প্রক্রিয়া স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সামূহিক

জীবনের সবচাইতে বড় কীর্তি এবং ধারক বিশেষ বিশেষ সমাজের নিজস্ব ভাষা। ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ছাড়া মানুষ হিসাবে ব্যক্তির বিকাশ অঘটনীয়। ভাষা স্মৃতিকে আশ্রয় দেয়, ব্যক্তির স্বপ্রকাশের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়, জ্ঞানের প্রবর্ধন সম্ভবপর করে তোলে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, কাছের সঙ্গে দূরের, এক প্রজন্মের সঙ্গে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রজন্মের বিচিত্র সম্পর্ক রচনা করে। তা ছাড়া পরিবার, গোষ্ঠী, শ্রেণী, ধর্ম, বিশ্বাসচক্র, বৃত্তি, শ্রমবিভাগ, গ্রামভিত্তিক, নগর-ভিত্তিক, রাষ্ট্রভিত্তিক নানা সংগঠন ব্যক্তিকে সামূহিক বিন্যাসের অঙ্গীভূত করে।

অঙ্গীভূত করে, কিন্তু বিলুপ্ত করতে পারে না। মৃত্যু ছাড়া ব্যক্তিকে নির্বিশেষ করা যায় না। মৃত্যুকে মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ, মহাপ্রয়াণ, নিবর্তন, স্বর্গারোহণ, দেহরক্ষা ইত্যাদি যে কোন সাধু নামই দেওয়া হোক না কেন মৃত্যুর অর্থ ব্যক্তির বিলোপ। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ব্যক্তি অনিঃশেষিত। তার প্রাতিস্বিকতা সমাজতাত্ত্বিকের ঈপ্সিত সরলীকরণের প্রতিবন্ধক, সমাজ-পরিচালকদের নানাবিধ পরিকল্পনার হিসেবে অনির্দেশ্য ও অনির্ভরযোগ্য উপাদান। এমনকি সর্বগ্রাসী জুলুমবাজ আধুনিক ফাসিস্ত-নাটশি-কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও ব্যক্তিকে পুরোপুরি কোন ছাঁচে ফেলে ঢালাই করা সম্ভব হয় নি। যাঁরা ঐসব রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাধ্য হয়ে বাস করেছেন, অপরিসীম যন্ত্রণা, অপমান, অত্যাচার সহ্য করেছেন, বহুক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের রচনা এবং সাক্ষ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি নিরঙ্কুশ শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ঐসব রাষ্ট্র ব্যক্তিকে সমষ্টির অংশমাত্রে পর্যবসিত করতে পারে নি। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যেসব কম্যুনিস্টদের চিনি তাঁদের কথাবার্তা, আচার-আচরণে যতই উগ্র দলগত একাত্ময় প্রকট হোক না কেন, ব্যক্তি হিসেবে তাঁরা প্রত্যেকেই একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র।

কিন্তু কোন ব্যক্তিই একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ অথবা স্বরাট্ নয়—এমনকি শিল্পী, গাণিতিক, সন্ন্যাসী সম্পর্কেও একথা সত্য। শুধুমাত্র খাওয়া-থাকা-পরার ব্যবহারিক তাগিদে নয়; আসঙ্গের অনারত, অনিবার্য, জৈব অভিকর্ষে ব্যক্তিমাত্রই অপরমুখী।

ব্যক্তির বিকাশের জন্য সমাজের প্রয়োজন আছে; কিন্তু সেই সমাজই ব্যক্তির বিকাশের সহায়ক যে-সমাজ ব্যক্তির প্রাতিস্বিকতাকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির স্বাধীন সহযোগের সম্ভাবনা

বাড়ায় এবং সহযোগের পথে যেসব বাধা আছে সেগুলি দূর করতে সচেষ্ট হয়। অসমসত্ত্বতাকে অগ্রাহ্য করে তার জায়গায় সামূহিক পিণ্ডকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় না আছে মানুষের সম্পর্কে জ্ঞান বাড়বার সম্ভাবনা, না আছে মানুষের কল্যাণ। সমাজতাত্ত্বিকেরা প্রায়শই একথা ভোলেন বলে তাঁদের যুক্তি যেমন অনেক সময়েই অভিজ্ঞতার দ্বারা অসমর্থিত, তাঁদের উক্তি তেমনি অনেক সময়েই হাস্যকর। ইতিহাসে যাঁরা কীর্তিমান তাঁদের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিকদের যুক্তি ও উক্তির অগভীরতা অনেকটা স্পষ্ট। রামমোহন ইংরেজের ব্রাহ্মণ দালাল, বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পেতিবুর্জোয়া, মাইকেল কায়স্থ ক্রিশ্চান, কেশব সেন বৈদ্য ব্রাহ্ম, বঙ্কিম সরকারী-চাকুরে, রবীন্দ্রনাথ জমিদার, এই ধরনের বেহুদা বুলি ঐ অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের প্রায় কিছুই বলে না। কিন্তু যাঁরা বিশেষ কৃতী ব্যক্তি নন, আপাত দৃষ্টিতে যাঁদের গড়পড়তা মনে হয়, তাঁদের সঙ্গেও কিছুটা পরিচয় ঘটলেই বোঝা যায় তাঁরা প্রত্যেকেই অনন্য এবং তাঁদের জীবন ও ব্যক্তিত্ব মোটেই একমুখী নয়। শান্তিনিকেতনে যে রিক্সাওয়ালাটি সারাদিন রিক্সা চালিয়ে তারপরেও খাতা-ভর্তি কবিতা লিখত, যে-মেয়েটি পরের বাড়ি সারাদিন ঝি-গিরি করে যেটুকু অবসর পেত বাংলা বই পত্র-পত্রিকা পড়ত, যে-মুটেটি পথে পড়ে থাকা মুমূর্ষু ভিখারীকে পরম মমতায় স্বেচ্ছায় বয়ে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে হাজির করেছিল, যে-ট্যাক্সিচালক পিছনের সিটে ফেলে যাওয়া হাজার টাকার থলি তার অন্যমনস্ক যাত্রীর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে, তাদের ব্যক্তিগত জীবন সমাজতাত্ত্বিকের অপরিজ্ঞাত, অথচ তাদের মতো বহুলোক আছে বলেই মানবসমাজের নুন কখনো একেবারে ফুরিয়ে যায় না। প্রলেটারিয়েট, পেতিবুর্জোয়া, বিহারী, মুসলমান, শিখ—এইসব অভিধা নিরর্থ অথবা বাস্তবসম্পর্কহীন নয়। কিন্তু এই-জাতীয় আখ্যার ভিতরে এইসব বিশেষ স্ত্রী-পুরুষদের কতটুকু পরিচয় মেলে?

অর্থাৎ আমার বক্তব্য হল জাতি, শ্রেণী, পেশাদারী সংগঠন, রাজ-নৈতিক দল, নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েৎ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এ-সবেরই বিচার-বিশ্লেষণ হোক, এদের আস্তিত্বিক সূত্র, আচার-আচরণের মধ্যে কার্য কারণের সম্পর্ক ও নিয়মের ধরন-ধারণ পরিলক্ষিত হোক, এদের ভিতরে পারস্পরিক সংযোগ এবং এদের সঙ্গে ব্যক্তির

সম্পৃক্তির চেহারাটি আলোচিত হোক। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণ ও বিচারের সময়ে আমরা যেন কিছুতেই না বিস্মৃত হই যে অনেক ব্যক্তিকে নিয়েই সমূহ আকার পায়, যে সমূহের সমৃদ্ধি, গতি, রূপান্তর ব্যক্তির সূত্রে ঘটে, যে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশিষ্ট, অবিভাজ্য, অদ্বিতীয় (যদিও অনেক সময়েই অনাত্মজ্ঞ), যে ব্যক্তি মাত্রই নিজেকে নিজে রচনা করবার কমবেশী শক্তি রাখে, যে সহযোগের ভিতর দিয়ে ব্যক্তির সৃজনশীলতাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার দ্বারাই সমূহ সার্থকতা অর্জন করে, যে যদি কোন মানবশাস্ত্র সামূহিক-সাম্পর্কিক ধারণা-কল্পনা, নিয়ম-শৃঙ্খলার অজুহাতে ব্যক্তির অনন্য, বহুবেধ, অনির্দেশ্য প্রাতিস্বিকতাকে খর্ব অথবা বিলুপ্ত করতে উদ্যোগী হয়, তাহলে তার সেই চেষ্টা ভ্রান্ত, অতিদিষ্ট, অকল্যাণকর। সমাজকে বুঝতে গেলে, তার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করতে হলে তার পারিবেশিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সামূহিক বৈশিষ্ট্য যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার, তেমনি দরকার ব্যক্তির বহুমুখী, পরিবর্তনশীল, নির্বাচনক্ষম অস্তিত্বের প্রতি প্রগাঢ় অভিনিবেশ, সেই অস্তিত্বের সঙ্গে প্রেমে, কর্মে, জ্ঞানে যথার্থ যোগসাধন।

খ। ইতিহাস, পরিবর্তন, প্রগতি

অতীত থেকে বর্তমানে ঘটনার প্রবাহ এবং সেই প্রবাহের সুসম্বদ্ধ বিবরণ—উভয় অর্থেই ইতিহাস কথাটি ব্যবহৃত হয়। যা যা ঘটেছে তার সব খবর অবশ্য আমরা কোন দিনই পাই না, পেলে তার চাপে ইতিহাস লেখবার সব চেষ্টাই তলিয়ে যেত। যেটুকু খবর পাই তা থেকেও ঐতিহাসিককে কিছু তথ্য বেছে নিতে হয়। সমস্ত সংগৃহীত ঘটনাকে নির্বিচারে স্রেফ একত্র করে পেশ করলে তাদের ভিতরে কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকের প্রথম কাজ হল অতীতের কোন একটি নির্বাচিত সীমাবদ্ধ সমস্যা ও খণ্ড সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা; সেইসব ঘটনা যে প্রকৃতই ঘটেছিল পরীক্ষা প্রমাণাদির দ্বারা সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। তারপর সেইসব তথ্য, ঘটনা, উপাত্তের ভিতরে সম্পর্কের অনুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠা করা। যে-সম্পর্কাবলীর সূত্রে অসংখ্য ঘটনা পরস্পরে অনুস্যূত এবং অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই সম্পর্কাবলী বাস্তবে ঘটনারাজিতে অন্তর্নিহিত অথবা ঐতিহাসিকের স্বকপোলকল্পিত, এ-সম্পর্কে ঐতিহাসিককে নিয়ত সতর্ক থাকতে হয়। যেখানে ঘটনাগুলি

নির্দিষ্ট এবং সম্পর্ক-বিষয়ক প্রশ্ন ও তার উত্তরবাচক প্রস্তাবটিও সচেতনভাবে সীমাবদ্ধ, সেখানে প্রস্তাবিত ব্যাখ্যার নির্ভরযোগ্যতা অথবা ভ্রান্তি কতকটা সহজেই নিরূপণ করা যায়। কিন্তু যেখানে ঘটনারাজি স্থান-কাল-পাত্রে বহুবিস্তৃত এবং প্রস্তাবিত ব্যাখ্যাটি বহু-ব্যাপী সেখানে ঐতিহাসিকে ঐতিহাসিকে মতভেদ যুক্তি প্রমাণের দ্বারা দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক বিশেষ সময় থেকে বিশেষ সময় পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষণার ফলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল, প্রচুর তথ্য-সংগ্রহ ও যুক্তি-বিন্যাসের সমর্থনে এই প্রস্তাবগুলি এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার ফলেই মৌর্যসাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর পরে দ্রুত ভেঙে পড়েছিল কি না, ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রসার কতখানি এবং কী কী ধরনের পরিবর্তন এনেছিল, এদেশ থেকে কেন এবং কীভাবে বৌদ্ধধর্ম অবশেষে প্রায় লোপ পেয়ে গেল—এসব বিরাট প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর এখনও পর্যন্ত অপ্রাপ্য। তার জন্য যেমন আরও অনেক তথ্য দরকার তেমনি দরকার প্রশ্নগুলিকে আরো তীক্ষ্ণ, সংকীর্ণ ও সুবিন্যস্তভাবে উপস্থিত করা।

বৈজ্ঞানিকের মতো ঐতিহাসিকও ঘটনা-পরম্পরার ভিতরে কার্য-কারণ সম্পর্ক খোঁজেন। কিন্তু কোন গবেষণাগারে নিজের প্রয়োজন মতো অতীতের ঘটনা-পরম্পরাকে আবার যথাযথ ঘটিয়ে তাদের সম্পর্ক যাচাই করা তাঁর অথবা অন্য কারো সাধ্যায়ত্ত নয়। তাঁর কার্যকারণ ব্যাখ্যা প্রায় ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মতো পুরোপুরি প্রমাণসিদ্ধ হতে পারে না। বেশ কিছু সুপ্রমাণিত ঘটনাকে সময়ক্রমে পরপর সাজিয়ে সযত্নে বিচার করলে তাদের ভিতরে কার্যকারণ সম্পর্কের সম্ভাবনা হয়তো অনেকটা সন্দেহাতীত বলে গ্রহণযোগ্য ঠেকে। কিন্তু অনেক সময় ধরে, অনেক জায়গা জুড়ে, অনেক মানুষকে জড়িয়ে যে ঘটনাসমুচ্চয় তাদের সামূহিক কার্যকারণ ব্যাখ্যায় বিস্তর ফাঁক থাকে। অথচ ইতিহাসকে বিশৃঙ্খল ঘটনাসমাবেশ বলে কোন ঐতিহাসিক মেনে নিতে পারেন না। ঘটনাক্রমের মধ্যে যে অনবচ্ছেদ ও পরি-বর্তনের সমাপাত দেখা যায়, তার ভিতরে নিয়ম-শৃঙ্খলা, ধারা, আভিমুখ্য, মানবীয় অর্থবহতা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। এই খোঁজ তাঁকে কখনও কখনও অতিসরলীকরণের দিকে

ঠেলে দেয়। ঘটনাক্রমের ব্যাখ্যায় বিশেষ একটি সূত্রকে তিনি পরিবর্তনের মুখ্য, কখনো বা একমাত্র সূত্র রূপে উপস্থাপিত করেন। সেটি হেগেলীয় তত্ত্বানুযায়ী ভাবের ডায়ালেকটিক হতে পারে, মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন শক্তি ও শ্রেণীসংগ্রাম হতে পারে, হ্বেবারীয় ব্যাখ্যায় ধর্মীয় ও জাতীয় প্রত্যয়াবলী হতে পারে, পারেটো-মস্কার ব্যাখ্যায় শক্তিমান গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণসামর্থ্য হতে পারে। পেশাদার ঐতিহাসিকেরা যে নিজেরা এই ধরনের কোন তত্ত্ব সচেতনভাবে উপস্থিত করেন তা নয়—তাঁদের প্রধান আনুগত্য ঘটনার যাথার্থ্যের এবং অনুক্রমের প্রতি—কিন্তু এইসব তত্ত্ব অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের ব্যাখ্যায় বিশেষ প্রভাব ফেলে। তাতে ঘটনার পারম্পর্য কিছুটা সহজবোধ্য হয় বটে, কিন্তু ঐতিহাসিকের যেটি প্রধান অবলম্বন—তথ্যের সত্যতার প্রতি নিষ্ঠা—সেটি শিথিল হবার আশঙ্কা থাকে।

ঘটনাবলীর সাক্ষ্যকে প্রাধান্য দিলে কোন একটিমাত্র বিশেষ কারণকে অথবা ধারাকে সবক্ষেত্রেই সামূহিক পরিবর্তনের প্রধান সূত্র হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশ, বহিরাগত প্রভাব, সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা, নৈতিক নির্দেশ-আচরণ, আর্থিক সম্পর্ক-বিন্যাস, শিল্পসাহিত্য, সামাজিক সংগঠন, রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান, প্রাযুক্তিক উদ্ভাবন, শ্রেণীসংগ্রাম ও বিভিন্ন গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, এবং ব্যক্তিদের সামর্থ্য, কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম—এদের সবগুলিই পরিবর্তনের সম্ভাব্য সূত্র। কখনো এদের মধ্যে কোনটি প্রধান হয়ে উঠতে পারে, কখনো কয়েকটির অথবা সবক'টিরই সমবেত চাপে সমাজের পরিবর্তন ঘটতে পারে। আগে থেকেই সাধারণ সিদ্ধান্তে না পৌঁছে প্রতিটি লক্ষণীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনাবলীর খুঁটিনাটি তথ্য-সংগ্রহ, বিচার বিশ্লেষণ করে তবেই তার কার্যকারণিক ব্যাখ্যার প্রস্তাব করা বিবেকী ঐতিহাসিকের দায়িত্ব।

কখনো কখনো কোন সমাজের সবদিকের লক্ষণীয় পরিবর্তন একই সময়ে প্রবল বেগে হয়তো ঘটতে পারে—সেইরকম পরিবর্তনকেই বিপ্লব বলা চলে—কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দিকের লক্ষণীয় পরিবর্তন একই সঙ্গে একইভাবে দেখা যায় না। বিভিন্ন দিকের ভিতরে সম্পর্ক থাকলেও সেই সম্পর্কাবলীর চেহারাটি কেমনতর প্রায়-ক্ষেত্রেই তা ঐতিহাসিকের অজ্ঞাত। ঐতিহাসিকরা সেই কারণে বিভিন্ন দিকের নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি আহরণ করে প্রথমে তাদের

নির্ণীত সম্পর্ক ও ক্রমের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা দিকের ইতিহাস রচনা করেন। রসায়নের ইতিহাস, ভাষার ইতিহাস, চিত্রকলার ইতিহাস, দর্শনের ইতিহাস, প্রযুক্তির ইতিহাস, বাণিজ্যের ইতিহাস, রাজ্যশাসনের ইতিহাস—প্রত্যেকটিরই নিজস্ব উপাত্ত, ধারণা, সাধনী-পদ্ধতি, সম্পর্কনির্ণয়ের সূত্র ইত্যাদি আছে। কাণ্টের দর্শনের সঙ্গে হিউম, বার্কলে, দেকার্তের দর্শনের সম্পর্ক যেরকম সুস্পষ্টভাবে ধরা যায় তাঁর সমকালীন আর্থিক বিন্যাস অথবা চিত্রাঙ্কনরীতির সঙ্গে তাঁর দার্শনিক চিন্তার সম্পর্ক মোটেই সেভাবে প্রতিভাত নয়। বিশেষ বিশেষ দিকের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের ভিত্তিতে কোন সমাজসভ্যতার, এমনকি মনুষ্যপ্রজাতির সামগ্রিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা অনেকে করেছেন। সেই চেষ্টা অনেকক্ষেত্রেই সুকল্পিত ও হৃদয়-গ্রাহী। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই এ-ধরনের সার্বিক ইতিহাসে লেখকের দার্শনিক আভিমুখ্য এবং নির্বাচনের একদেশদর্শিতা যত প্রকট, তথ্যানুগত্য ও বিষয়মুখিতা ততটা দৃঢ়মূল নয়।

সবদিকের পরিবর্তন একই দিকে, একইভাবে, একই সময়ে ক্বচিৎ ঘটে; তথাকথিত ভিত্তি এবং উপরিস্থের স্থান বদল হয়; ভিন্ন ভিন্ন অনুবন্ধে পরিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন সূত্র প্রাধান্য পায়; পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে উন্নতির বা বিকাশের বিচারের জন্য পৃথক পৃথক নির্ণায়কের প্রয়োজন পড়ে। তা সত্ত্বেও অন্য মানুষদের মতো অধিকাংশ ঐতিহাসিকই পরিবর্তনের ভিতরে একটি সামূহিক অর্থ, একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা, একটি প্রাজাতিক উদ্দেশ্যের ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান করেন। যে-পরিবর্তন শুধুমাত্র পরিবর্তন নয়, যার ভিতর দিয়ে এবং যার ফলে মানুষের কাছে মূল্যবান্ গুণাবলীর সমাজ-সংগঠনে ব্যাপকতর ও দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা ঘটে সেই পরিবর্তনেরই অপর নাম প্রগতি। প্রগতির কল্পনা ইতিহাসের ঘটনাক্রমকে অর্থান্বিত করে। সমগ্র অথবা অনবচ্ছিন্ন ভাবে মানুষের প্রাজাতিক ইতিহাসে প্রগতি ঘটে থাক বা না-ই থাক ইতিহাসের কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে কোন কোন সমাজে প্রগতির যথেষ্ট প্রমাণ মেলে—এ-সম্পর্কে অন্তত আমি সংশয়ের কারণ দেখি না। অক্ষরহীন মনুষ্য-প্রজাতি যখন অক্ষরতন্ত্রের উদ্ভাবন করল, বনবাসী অথবা যাযাবর গোষ্ঠীরা যখন কর্ষণ-পদ্ধতি অবলম্বন করল, ঔষধ এবং চিকিৎসার দ্বারা মানুষ যখন প্লেগ, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মহামারী দমনে সক্ষম

হল, গায়ের জোরে শাসনের বদলে নীতি-নিয়মের শাসনের আদর্শ যখন স্বীকৃতি পেল, টলেমীয় ব্যাখ্যার জায়গায় কোপারনিকাসের ব্যাখ্যা যখন গৃহীত হল, তখন যে পরিবর্তন ঘটল তাকে অবশ্যই প্রগতি বলা সংগত।

কিন্তু এখানেও কয়েকটি ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা দরকার। নৈতিক প্রগতি আর প্রাযুক্তিক প্রগতির নির্ণায়ক সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে-সমাজের মানুষদের মধ্যে স্বাধীনতা, সততা, সৃজনশীলতা, করুণা, সহযোগ ইত্যাদি গুণ বেশি ব্যাপক ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজ যে-সমাজে এই গুণগুলি শিথিল অথবা প্রতিকূল ব্যবস্থার চাপে কমবেশী দমিত বা নিতান্ত কুশিত তার চাইতে নৈতিক দিক থেকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট এবং প্রগতিসম্পন্ন। অপরপক্ষে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি এবং শ্রমের অপচয়ের সংক্ষেপণের দ্বারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রগতি নির্ণীত হয়। উৎপাদন বাড়লে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজতর হবার সম্ভাবনা, ফলে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক চাপ কমার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা যে সবক্ষেত্রে ঘটেছে অথবা ঘটছে তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে না। বরং সমকালীন অভিজ্ঞতা থেকে এই আশঙ্কাই প্রধান হয়ে উঠছে যে নীতিবোধহীন প্রাযুক্তিক প্রগতির চাপে প্রাজাতিক নৈতিকতা যেন ক্ষীয়মাণ। প্রাযুক্তিক প্রগতিকে নৈতিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা আজ বিশেষ জরুরী, একথা কেউ কেউ মানেন; কিন্তু কীভাবে যে সেটি করা যাবে তা আজও আমাদের অনধিগম্য। বিকেন্দ্রীকরণ, আর্থিক-সামাজিক জীবনে কারিগরী কাজ এবং শ্রমনিবিড় অনতিকায় শিল্পের প্রতিষ্ঠা, সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ইত্যাদি প্রস্তাবকে আরও কিছু চিন্তকের মতো আমিও দীর্ঘকাল ধরে সমর্থন করে আসছি। কিন্তু প্রাযুক্তিক প্রগতিকে তারি সঙ্গে কীভাবে অব্যাহত রাখা যাবে সেটি কেউ যুক্তি ও অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য বৈশদ্যে ব্যাখ্যা করেছেন বলে জানা নেই। উপায় উদ্ভাবনের আগে অন্তত বোঝা দরকার যে প্রাযুক্তিক প্রগতি, নৈতিক প্রগতি অথবা তাত্ত্বিক প্রগতির কোন একটি ঘটলেই সমাজের অপর ক্ষেত্রগুলির প্রগতি অবশ্যম্ভাবী নয়, বরং যথেষ্ট সতর্ক না হলে এক ক্ষেত্রের প্রগতি অন্য ক্ষেত্রে বিপরীত ধারাকে প্রবলতর করতেও পারে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দীর্ঘকালব্যাপী পরম্পরাশ্রয়ী জীবনযাত্রায় দয়ামায়া, অহিংসা, পারস্পরিক

সহযোগ, সততা, সাহস, কল্পনার ঋদ্ধি ও চিত্রাঙ্কনের নৈপুণ্য আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে। কিন্তু প্রাযুক্তিক দক্ষতার বিচারে তারা সমকালীন শ্বেতকায় অস্ট্রেলিয়ানদের চাইতে অনেক হাজার বছর পিছিয়ে আছে; এবং গত দুশো বছর শেষোক্তদের আগ্রাসী সংস্রবে আসবার ফলে তাদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। আদিবাসীদের নৈতিকতাকে যতই শ্রদ্ধা করি না কেন তাদের জীবনযাত্রা আজ আমরা বেছে নিতে চাই না এবং পারি না। অপরপক্ষে সমকালীন প্রাযুক্তিক প্রগতি আমাদের যতই আকৃষ্ট করুক এখনকার আগ্রাসী, অসূয়ক, বস্তুরতির দ্বারা সংবেশিত সভ্যতার প্রকরণে বিবেকিতার বিকাশ-সম্ভাবনা স্পষ্টতই প্রতিহত। মানুষের ইতিহাসের যে কূটাভাস এখানে দেখি সার্বিক প্রগতিশীলতার প্রকল্পে তার সমাধান মেলে না।

দ্বিতীয়ত, প্রগতির যে কোন নির্ণায়কই আমরা বাছি না কেন এবং সমাজ-সংস্কৃতির যে কোন দিককেই প্রগতির নির্ণায়ক দিয়ে বিচার করি না কেন, এমন কোন বিশেষ সমাজ ইতিহাসে পাওয়া যায় না যেখানে প্রগতি অনবচ্ছিন্ন, যেখানে একটি যুগে বিশেষ কোন অথবা বেশ কয়েকটি দিকে পরাকাষ্ঠা অর্জিত হবার পর আপজাত্য বা অবক্ষয় পরবর্তী যুগে প্রবল হয় নি। অমন যে পেরিক্লিসের আথেন্স, অমন যে গন্ধার-মথুরার ভাস্কর্য, অমন যে তাই-ৎসুঙ্-এর সুন্দরী নগরী চ্যাং আন, অমন যে আলহামব্রার স্থাপত্য, অমন যে রেনেসাঁসের ফ্লোরেন্স, অমন যে মোগলদের দিল্লী-আগ্রা—প্রত্যেকটিরই পরাকাষ্ঠায় পৌঁছবার কিছুকাল পরে পতন ঘটেছে। এই পতনের অনিবার্যতা থেকে প্রগতির অবাস্তবতা প্রমাণিত হয় না, কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরাকাষ্ঠা এইসব সমাজে ঐসব নির্দিষ্ট যুগে দেখা যায় তা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে প্রগতিশীল পরিবর্তনেরই পরিচায়ক। অপরপক্ষে এই-সব পাতনিক অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ইতিহাসে প্রাগতিক অনবচ্ছেদের প্রকল্পকে সমর্থন করে না। যা বলা যেতে পারে তা হল, মানুষের প্রাজাতিক ইতিহাসে এক অঞ্চলে কোন সভ্যতার পতনের পাশাপাশি অন্য অঞ্চলে হয়তো আরেকটি সভ্যতার বিকাশ দর্শনীয়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে (যদিও সবক্ষেত্রে নয়) পরবর্তী সভ্যতার প্রগতি পূর্ববর্তী অবসন্ন এমনকি লুপ্ত সভ্যতা থেকে ফলপ্রসূ উপাদান সংগ্রহ ও প্রেরণা লাভ করতে পারে। দু'একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোন সমাজের আভ্যন্তরীণ সংঘাত প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রায় আমূল উচ্ছেদ ঘটিয়ে তার চাইতে

বিশেষ বিশেষ দিকে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন করে বটে, কিন্তু এই জাতীয় ডায়ালেক্‌টিক্যাল প্রগতির উদাহরণ ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোন সভ্যতার পতনের কাল এবং সেই অঞ্চলে আবার কোন বিকাশশীল সভ্যতার অভ্যুত্থানের কাল—এই দুইয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধান থাকে, এবং প্রায়শই এই নতুন বিকাশশীল সভ্যতার বাহক হয়ে আসে বহিরাগত আগ্রাসী কোন মানবগোষ্ঠী। কোন ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌-এর নিয়মে বিপ্লুত সিন্ধু-সভ্যতার ভিতর থেকে বিপ্রতীপ প্রাগতিক শক্তিরূপে আর্যসভ্যতা উদ্ভূত হয় নি। হূনরা বাইরে থেকে এসে ক্ষীয়মাণ রোমক সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল, তাতাররা একইভাবে ধ্বংস করেছিল চৈনিক সভ্যতাকে—উভয় ক্ষেত্রেই নতুন করে সভ্যতা আবার গড়ে উঠতে অনেকটা সময় লেগেছিল। মানবিক বিকাশের আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও সামর্থ্য প্রগতির প্রতিশ্রুতিবহ বটে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির কোন প্রত্যাভূতি তা থেকে মেলে না।

তৃতীয়ত, মানবিক সার্থকতার কোন কোন ক্ষেত্র আছে যেখানে পরবর্তীকালের পরাকাষ্ঠা পূর্ববতীকালের পরাকাষ্ঠা থেকে প্রেরণা পেতে পারে, কিন্তু পূর্ববর্তীর চাইতে উচ্চতর শিখরে সম্ভবত উঠতে পারে না। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ। 'প্রোজ্জ্বল সম্রাট' মিঙ্‌ হুয়াঙ্‌-এর রাজত্বকালের শেষভাগে তাতার বিদ্রোহের ফলে তিনকোটি ষাট লক্ষ লোক মারা যায়; কিন্তু ঐ সম্রাটেরই সমকালে লি পো এবং তু ফু-র যুগল প্রতিভা চীনা কবিতায় যে অমরত্ব আনে আজো তা তুলনাহীন। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কোন প্রগতি অকল্পনীয় যার সূত্রে বলা যায় যে সোফোক্লিস, কালিদাস, দান্তে, শেক্সপীয়র, গোয়েটে, ডস্টয়েভ্‌স্কি, রবীন্দ্রনাথকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারে। প্রযুক্তি থেকে সূক্ষ্মতর প্রযুক্তিতে প্রগতি আছে, কিন্তু এইসব মহাশিল্পীদের পূর্বে, সমকালে এবং পরবর্তীকালে আরো অনেক শিল্পী যদিও উল্লেখযোগ্য, যদিও এঁদের কৃতির বিচার ও সমালোচনা অবশ্যই সম্ভব এবং কাম্য, তবু সঙ্গে সঙ্গে এ-সত্যও অনস্বীকার্য যে এঁরা আপন আপন কৃতির ক্ষেত্রে এক একটি মাউণ্ট এভারেস্ট। কোন ব্যক্তির পক্ষে যে এতখানি বিকাশ সম্ভব তা দেখে আমরা বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, আনন্দে মানবিক সম্ভাবনার জয়গান করতে পারি। কোন সময়েই এঁরা যে ঢেঁকির মতো, কিংবা টলেমীয়

ব্যাখ্যার মতো, কিংবা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো প্রগতির ফলে বাতিল হতে পারেন এমন প্রস্তাব নেহাতই আজাড়িয়া।

গ। রেনেসাঁস, সর্বোদয় ও মনীষার ভূমিকা

একসময়ে আমি মনে করতাম কোন জরিষ্ণু, নির্বিঘ্ন, পুনরাবৃত্তি-নির্ভর সমাজে জনসাধারণ অথবা অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ যখন নানা কারণের সমাবেশে লক্ষণীয়ভাবে প্রাণবন্ত, সৃষ্টিশীল, উদ্ভাবনামুখী হয়ে ওঠে তখন সেই ঐতিহাসিক পরিবর্তনেরই নাম রেনেসাঁস। আমার ষাটোত্তীর্ণ বয়সের অভিজ্ঞতা, পঠন-পাঠন এবং আলাপ-আলোচনার ফলে আমি এখনো মনে করি প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই বহুমুখী বিকাশের সম্ভাবনা বিদ্যমান। আমি আজও নিশ্চিত যে সব মানুষের স্বাধীন সৃষ্টিশীল বিকাশই মনুষ্যত্বের প্রকৃত আদর্শ এবং এই বিকাশের নির্ণায়ক দিয়েই প্রাজাতিক, সামাজিক এবং প্রাতিস্বিক প্রগতির বিচার সংগত। অর্থাৎ আমার মানবতন্ত্রী দর্শনের এবং সর্বোদয়ী দর্শনের আভিমুখ্য একই দিকে। কিন্তু এখন আমার মনে হয় ইতিহাসে যে জাতীয় ঘটনাসমুচ্চয়কে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া হয় এবং দেওয়া অভিজ্ঞতা-সমর্থিত তা একই সময়ে সব অথবা অধিকাংশ মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সমার্থ নয়। উভয়কে সমার্থ বলে ধরলে স্বীকার করতে হয় যে ইতিহাসে রেনেসাঁস কখনো আদৌ ঘটে নি। অনেকগুলি রেনেসাঁসের ফলে বহু মানুষের, হয়তো-বা কোনদিন সব মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভবপর হবে, কিন্তু ইতিহাসে রেনেসাঁস নামে যা ঘটেছে এবং ঘটে তা সর্বদাই উনজনদের প্রতি—যে উনজনদের ভিতরে বিভিন্ন কারণ সমাবেশের ফলে মানুষের প্রাজাতিক মনীষা বিশেষ কালে বিশেষ সমাজে প্রবলভাবে স্ফুরিত।

মনীষা বলতে কী বোঝাচ্ছি একটু স্পষ্ট করা দরকার। জন্মসূত্রে সবমানুষই অন্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি সামর্থ্যসম্পন্ন গুরুমস্তিষ্কের অধিকারী। প্রাজাতিকভাবে বিশিষ্ট মস্তিষ্ক-নার্ভীয় তন্ত্রের অধিকারী মানুষ বিভিন্ন ভাষা এবং অক্ষরমালার উদ্ভাবন করেছে, অভিজ্ঞতাকে ধারণায় রূপ দিয়েছে, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের সাহায্যে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের নিয়মাদি আবিষ্কার করেছে, অতীত কীর্তি এবং জ্ঞানের উত্তরলব্ধিকে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছে, যা আছে তা থেকে

উপাদান নিয়ে যা নেই তাকে কল্পনা করেছে এবং রূপ দিয়েছে। এ-সবই মননের কাজ। জড়ত্ব বা মস্তিষ্কের কোন অনারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্তজনদের বাদ দিলে সব মানুষের ভিতরেই মননের সামর্থ্য বিদ্যমান। কিন্তু সামর্থ্য নিয়ে জন্মালেই আপনা থেকে সে-সামর্থ্যের বিকাশ ঘটে না। ভাষাও মানুষকে যত্ন করে শেখাতে হয়। মানব-সমাজ থেকে কোন মানুষকে জন্মাবধি বিচ্ছিন্ন করে রাখলে তার প্রকাশ ও ভাববিনিময় শুধু অল্প কয়েকটি ধ্বনি এবং অঙ্গভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনের উত্তরাধিকার থেকে তখন সে বঞ্চিত এবং সে-কারণে সম্ভাবনা সত্ত্বেও তার মনন-সামর্থ্য দরিদ্র ও বিকাশহীন।

মননের বিকাশ নানাভাবে ঘটে এবং যথেষ্ট বিকশিত মনন-শক্তিকেই আমি এখানে মনীষা বলছি। যাঁরা অসামান্য প্রতিভাবান—যেমন লেওনার্দো, গোয়েটে, রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন—তাঁরা সম্ভবত প্রতিভা নিয়েই জন্মান, কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রেও এবং অবশ্যই অন্যদের ক্ষেত্রে মননের বিকাশ উপযোগী সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও ব্যক্তিগত অনুশীলনের উপরে নির্ভর করে। পূর্বসূরিদের কৃতির সঙ্গে পরিচয় এবং তা থেকে পুষ্টি আহরণ, বর্তমানের আপাতবিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতা সমুচ্চয়ের বিশ্লেষ-সংশ্লেষ করে তা থেকে অর্থের আবিষ্কার, জিজ্ঞাসা, কল্পনা ও প্রকাশের স্বাধীনতাকে অকম্প্য নিষ্ঠায় নিজের অস্তিত্বের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা, ভাষা এবং বিভিন্ন প্রকাশ-মাধ্যমের সম্ভাবনা নিয়ে নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সেই সূত্রে সূক্ষ্মতর, দৃঢ়তর প্রকাশ-দক্ষতা অর্জন, পরিবর্তনে সাড়া দেবার উন্মুক্ত ও সাহসী প্রতিন্যাস—এসবই অনুশীলনের অঙ্গ এবং মনীষার লক্ষণ।

এখন সব মানুষের ভিতরেই মননের সামর্থ্য থাকলেও কোন সমাজে সকলে সমান প্রযত্নে তার অনুশীলন করেন না, বহুক্ষেত্রেই করবার সুযোগ পান না। শ্রমের বিভাজন, সম্পদের স্বল্পতা, সমাজ-সংগঠনে অসাম্য ও ক্ষমতার কেন্দ্রাভিগতা, পুনরাবৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রাধান্য, মানসিক পরিশ্রমে অনীহা, জিজ্ঞাসা, কল্পনা ও প্রকাশের স্বাধীনতা দমনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত শক্তির প্রয়োগ, নূতনকে ভয় ও পরিচিতকে আঁকড়ে ধরে প্রত্যাভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা—এসবই মননের বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে। ইতিহাসের যেসব অধ্যায়কে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয় সে-গুলির সময়েও কিছু মনীষী আলোর শিখা

জ্বালিয়ে রাখেন; তাঁদের আলো নিজের যুগে বিকীর্ণ না হলেও পরবর্তীকালে তার খবর আমরা পাই।

কোন সমাজে বিভিন্ন কারণের সমাবেশে যদি বেশ-কিছু কাল ধরে মননের চর্চা ক্ষীণ হয়ে আসে, এবং তার পরে যদি সেই সমাজে আবার অন্যবিধ কারণ-সমাবেশে লক্ষণীয়ভাবে বেশ-কিছু ব্যক্তির মধ্যে বেশ-খানিকটা সময় ধরে মননের স্ফুরণ ঘটে, তাহলে প্রথম অবস্থার বৈসাদৃশ্যে দ্বিতীয় অবস্থাকে রেনেসাঁস বলা যায়। এই কারণগুলি শুধু বাইরের নয়, ভিতরেরও বটে। বাইরে থেকে ধাক্কা লাগা বা বাইরের অবস্থা অনুকূল হওয়া যথেষ্ট নয়; ভিতর থেকে সেই ধাক্কায় একাগ্র মননে সাড়া দিতে পারা, সেই অনুকূলতাকে বিকাশের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারা—এটিও রেনেসাঁসের শর্ত। এই সাড়া যাঁরা দেন তাঁরা ভাবুক, মনীষী, শিল্পী, উদ্ভাবক, পথিকৃৎ। তাঁরা তখনো সংখ্যায় অল্প, কিন্তু এত অল্প নন যে তাঁদের সেই উদ্যোগ-উদ্যম সমাজ অবহেলা করতে পারে। সেই সংখ্যা কত হলে তাঁদের আলো সমাজকে এবং ইতিহাসকে আলোকিত করতে পারে তা আমি জানি না। সেটি সম্ভবত নির্ভর করে তাঁদের সামর্থ্য কতখানি, তাঁদের নিষ্ঠা কত গভীর, তাঁদের ভিতরে পারস্পরিক সহযোগ কতটা প্রশ্রিত, যে সমাজে ও যুগে তাঁরা বাস করছেন সেটি পূর্বে কতটা নিশ্চল হয়েছিল, যে অবস্থা-নিচয় তাঁদের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের কাজ করেছে তা কতটা সৃজনশীলতার অনুকূল—এইসব এবং অন্যান্য সূত্রের উপরে। ভাসারির সময়ে এবং তার ঠিক পূর্ববর্তীকালে ইতালিতে সহস্রাধিক শিল্পী ও মনীষীর ক্রিয়া-কর্মের খবর মেলে। রামমোহনের কলকাতায় আসা থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত বঙ্গদেশে কয়েক শো সাহিত্যিক ও ভাবুকের সাক্ষাৎ পাই যাঁদের মনীষা এবং অনুশীলন বাংলা ভাষাকে অশেষ সমৃদ্ধি দান করেছে, যাঁদের কৃতি আমাদের মৃত্যুর পরেও পরবর্তীকালে আলোক বিকিরণ করতে সক্ষম।

এঁদের মধ্যে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ বৈদ্য, কেউ কায়স্থ, কেউ নবশাখ-ভুক্ত, কেউ জমিদার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ সরকারী অথবা বে-সরকারী চাকুরে, কেউ সাংবাদিক, ডাক্তার বা উকিল। কিন্তু রেনেসাঁসের দিক থেকে এঁদের মুখ্য পরিচয় এঁরা মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি। এঁরা বহিরাগত উপাদানকে মননের দ্বারা স্বকীয় করেছিলেন; দেশজ ঐতিহ্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তা থেকে কিছু বর্জন ও কিছু গ্রহণ করেছিলেন; এঁরা

অনুসন্ধিৎসা এবং কল্পনাকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন ; নিজেদের স্বাধীন এবং অনুশীলিত ব্যক্তিত্বকে নানারূপে প্রকাশিত করেছিলেন। সমস্ত সমাজ অবশ্যই এঁদের প্রচেষ্টায় যোগ দেয় নি, বহুক্ষেত্রেই এঁদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে নি, এবং এঁদের কৃতি ঐতিহ্যশাসিত ঔপনিবেশিক সমাজকে রূপান্তরিত করে নি। কিন্তু রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার থেকে বঙ্কিম-হরপ্রসাদ-রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতিরা লিখেছিলেন বলেই আজ বাংলাভাষায় দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজতত্ত্ব-ইতিহাস বিষয়ে রচনা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। এবং যখন একদিন এদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর হবে, লোকশিক্ষার সুচিন্তিত ও ব্যাপক ব্যবস্থা চালু হবে, আর্থিক-সামাজিক অসাম্য ও শক্তির কেন্দ্রীকরণ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাবে, জনসাধারণ নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণের সুযোগ-সুবিধা অর্জন করবে, তখন আমাদের রেনেসাঁসের উত্তরলব্ধি তাদের জীবনকেও সমৃদ্ধতর করে তুলবে। তখনো যে সর্বোদয় ঘটবে তা নয়—সে আরো অনেক মানুষের অনেক সময় ব্যাপী সাধনার ফল—কিন্তু হয়তো তখন স্পষ্টতর হবে যে রেনেসাঁসের কৃতি শুধু স্বগুণেই অমূল্য নয়, সমাজের সার্বিক উন্নতি সাধনেও তার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

ভারতীয় ঐক্যের সন্ধানে

ভারতবর্ষ নিয়ে যাঁরাই কিছু বলেন অথবা লেখেন তাঁরাই সাধারণত এই উপমহাদেশের দুটি বৈশিষ্ট্যের উপরে ঝোঁক দিয়ে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস আপাতদৃষ্টিতে বহু বৈচিত্র্য থাকলেও ভারতবর্ষের ঐক্য সুগভীর এবং অপ্রতর্ক্য, এবং যদিও এদেশের রাষ্ট্রিক ইতিহাসে বারবার পরিবর্তন দেখা যায়, এদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরম্পরায় কোন ছেদ নেই। গত প্রায় দেড়শো বছর ধরে এই দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এত বেশি সম্প্রচার হয়েছে যে শুধু স্বল্পশিক্ষিতরা নয়, উচ্চশিক্ষিতরাও এই দাবি স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাসে কৃষ্ণ যদি বা মেলেন, বাহ্যজগৎ সম্পর্কে প্রস্তাব তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এই দুটি তথাকথিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে উন্মুক্ত এবং অভিনিবিষ্ট আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই আলোচনা একদিকে যেমন এই উপমহাদেশের সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে, অন্য দিকে তেমনি তা আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার অন্যতম অপরিহার্য শর্ত।

সাধারণত আমরা যখন ভারতবর্ষের ঐক্যের কথা বলি তখন ভারতবর্ষের যে ছবিটি আমাদের কল্পনায় প্রতিভাত হয় সেটি হল এই উপমহাদেশের যে অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সব চাইতে ঘনিষ্ঠ তারই ছবি। যে মানুষ বাংলাদেশের নদীনালা, নরম মাটি আর ভিজে হাওয়ায় তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন তাঁর মনে ভারতবর্ষের যে রূপ তার সঙ্গে রাজস্থানের রুক্ষ, ধূসর সৌন্দর্যের সাদৃশ্য কোথায়? পঞ্জাব থেকে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বছরে গড়পড়তা যতটা বৃষ্টি হয় চম্বল, তাপ্তি, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীর অন্তর্বর্তী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত বিরাট অঞ্চলে তার অর্ধেক বৃষ্টিও হয় না। সেই অঞ্চলকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বলা পরিবেশকে পরিবর্তন করবার দায়িত্ব এড়ানোর সমার্থক। পূর্ব এবং পশ্চিমঘাটের প্রকৃতি থেকে শীত ঋতু প্রায় নির্বাসিত; ফলে উত্তর প্রদেশের হিম হাওয়ায় দ্রবিড় জন পারক্য ছাড়া আর কীই বা অনুভব করতে পারেন? শুধু ভূ-প্রকৃতির দিক থেকেই নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এই উপমহাদেশ এতই

অসমসত্ত্ব যে তার সমগ্ররূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য তো বটেই, হয়তো বা অসম্ভব।

অনেকে ভারতবর্ষকে পশ্চিম ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষসূত্রে যতটুকু জানি তাতে ইয়োরোপের চাইতে ভারতবর্ষকে অনেক বেশি বিচিত্র এবং দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হয়। পশ্চিম ইয়োরোপ অনেকগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত বটে, এবং এইসব রাষ্ট্রের আলাদা আলাদা ভাষার প্রচলন আছে ঠিকই, কিন্তু প্রথমে রোমক সাম্রাজ্য, পরে খৃষ্টধর্ম এবং বিশেষ করে আধুনিক ইতিহাসে শিল্পবিপ্লব প্রতীচ্যে মোটামুটিভাবে এমন একটি সংযুতি রচনা করেছে যা সেখানকার অধিবাসীদের পোশাক-আশাকে, আহারে-বিহারে, অনুষ্ঠানে-আচরণে নিতান্ত প্রত্যক্ষ। ভারতবর্ষের উপযোজনের এবং অভিযোজনের শক্তি বহুখ্যাত, কিন্তু সেই শক্তির প্রকল্পকে মেনে নেওয়ার পরও কি প্রশ্ন থাকে না যে মালাবারের নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ, মহারাষ্ট্রের অতিশূদ্র মহার, পঞ্জাবের শিখ, ছোটনাগপুরের মুণ্ডা, কাশ্মীরবাসী মুসলমান এবং পূর্বাঞ্চলবাসী নাগা জনজাতিদের ভারতীয় আখ্যা দেওয়ার দ্বারা সামান্যীকরণের কোন্ সূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়? আধুনিক ইয়োরোপে একদিকে অঞ্চল থেকে অঞ্চলে লোকচলাচল এবং অন্যদিকে একভাষা থেকে অন্যভাষায় তর্জমা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সেখানকার সাংস্কৃতিক সাংকর্য এখন প্রায় স্বয়ম্ভর। সুইডেন, নরওয়ে, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যাণ্ড—প্রত্যেক দেশের আধুনিক সাহিত্য অপর দেশের সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত এবং এর প্রতিটি দেশের শিক্ষিত পাঠক ডস্টয়েভ্স্কি, ডিকেন্স, ফ্লোবেয়র, ইবসেন, রিলকে, পিরান্দেলো, কাফ্কা প্রমুখ লেখকের রচনাবলীর সঙ্গে কয়েক প্রজন্ম ধরে পরিচিত। অপরপক্ষে গ্রামভিত্তিক ভারতবর্ষে শিক্ষিতজনও নিজের অঞ্চলের বাইরে অন্যান্য অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য সম্পর্ক কতটুকুই বা খোঁজ রাখেন? তামিল, তেলুগু, কানাড়ি, মালয়ালম প্রভৃতি দক্ষিণী ভাষার কথা যদি নাও ধরি মরাঠী, গুজরাটী, পঞ্জাবী, উর্দু, এসব ভাষা থেকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির নির্ভরযোগ্য অনুবাদ অথবা এইসব সাহিত্য-সম্বন্ধে বিচক্ষণ আলোচনা এ তাবৎ কতটুকুই বা বাংলা-সাহিত্যে হয়েছে? ফলত ভারতবর্ষকে একটি দেশ এবং সেখানকার অধিবাসীদের একটি জাতি বলার মধ্যে আমাদের উৎকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটলেও প্রশ্নের উত্তর মেলে না।

অবশ্য এক হিসেবে আমার ভারতীয়ত্ব এখনো পর্যন্ত প্রশ্নাতীত। গত সাতাশ বছরের ভ্রাম্যমাণ জীবনে আমাকে বহুদেশে যাতায়াত করতে হয়েছে, এবং যে দলিলটি সঙ্গে না থাকলে এটি সম্ভব হত না তাতে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে দলিলবাহক শিবনারায়ণ রায় ইণ্ডিয়া নামক রাষ্ট্রের একজন নাগরিক। নিষ্ক্রমপত্রের এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে মূল্যবান; এবং যদিও বিশ্বনাগরিকতা আমার আদর্শ তা সত্ত্বেও এই দলিলটি খোয়া গেলে বা অতিপন্ন হলে আমাকে যে অন্যদেশে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হতে পারে এটুকু কাণ্ডজ্ঞান আমি এখনো হারাই নি। কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকতা থেকে ভারতীয়ত্বের কতটুকুই বা হদিশ মেলে? আইনত যে রাষ্ট্রের আমি নাগরিক বয়সের বিচারে তা আমার চাইতেও অর্বাচীন। আসমুদ্র-হিমাচল যে উপমহাদেশ এবং ১৯৪৭ এর বিভাগের পর ইণ্ডিয়া তথা ভারত নামে যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তারা সহব্যাপ্ত নয়। ইয়োরোপে এবং আরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতি এবং রাষ্ট্রের সহব্যাপ্তি বেশ কিছুকাল যাবৎ স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত বটে (যদিও সেখানেও এর ব্যতিক্রম আছে), কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। এখানে রাষ্ট্রের সীমারেখা যদি বা নির্দিষ্ট, জাতির চৌহদ্দি বেশ গোলমেলে। বাংলাদেশ এখন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র, আর পশ্চিমবঙ্গ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাঙালি জাতি বলতে শুধু কি বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরই বোঝায়?

ভারতরাষ্ট্র এবং ভারত উপমহাদেশ উভয় ক্ষেত্রেই ইণ্ডিয়া শব্দের প্রয়োগ এড়াবার জন্য সম্প্রতি অনেকে দক্ষিণ এশিয়া শব্দের আমদানি করেছেন। তার উপযোগিতা স্বীকার্য, কিন্তু ইতিহাসের বিচারে রাষ্ট্রীয় ভূগোলের সীমা খুব বেশি কি নির্ভরযোগ্য? আমার কৈশোর যৌবন কালে এই উপমহাদেশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এবং রাজন্যদের ইণ্ডিয়ার মধ্যে বিভক্ত ছিল। স্বাধীনতার সময়ে এই উপমহাদেশ নতুন ভিত্তিতে দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়; এখন সেখানে দেখছি তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আমার জীবদ্দশায় সম্ভবত এই রাষ্ট্রিক ভূগোলে কোনো উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটবে না, কিন্তু এখন থেকে এক শতাব্দী পরে এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রিক চেহারা কী দাঁড়াবে তা কি খুব নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা চলে? হয়তো তিন রাষ্ট্র মিলে একটি আমেল রাষ্ট্রের উদ্ভব হতে পারে; হয়তো ইণ্ডিয়া রাষ্ট্র ভেঙে তা থেকে বিচ্ছিন্ন দ্রবিড় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে; এমনকি বিভিন্ন প্রধান ভাষার ভিত্তিতে

অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তিও একেবারে অসম্ভব নয়। এর কোনোটিই আমি বিশেষভাবে কাম্য মনে করি না; কিন্তু যেসব জটিল এবং বহুবাচনিক ঘটনাসমাবেশ ইতিহাসের গতিকে নির্দিষ্ট করে আমার কামনা এবং উদ্যম বড় জোর তার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

ফলত রাষ্ট্রীয় সীমারেখার সূত্রে ভারতবর্ষের কোনো ব্যক্তার্থ এতাবৎ মেলে নি। সুপরিকল্পিত সিন্ধুসভ্যতার ব্যাপ্তি উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আবদ্ধ ছিল। আর্য জনজাতিরা অনার্যদের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে বিস্তর যুদ্ধ বিগ্রহ করে থাকলেও বিস্তৃত কোনো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অনেকটা অংশ জুড়ে ষোলটি মহাজনপদ গড়ে উঠেছিল। এদের নাম অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন, অশ্মাক, অবন্তী, গন্ধার, এবং কম্বোজ। ক্রমে এদের ভিতরে মগধ প্রধান হয়ে ওঠে। মৌর্য সম্রাটদের যুগে এই উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল সর্বপ্রথম একটি রাজশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে। কিন্তু এই প্রাধান্যের অনেকটাই ছিল বাস্তব শাসনের দ্বারা অসমর্থিত; চোল, পাণ্ড্য প্রমুখ দ্রবিড়রা এই মৌখিক প্রাধান্যেরও অন্তর্গত ছিল না; এবং এই ঢিলেঢালা সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল খুবই অল্পকাল। তারপর ইংরেজ অধিকারের পূর্ববর্তী দু'হাজার বছরের মধ্যে বেশ কয়েকবার এই উপমহাদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয়েছে, কিন্তু সমস্ত অঞ্চল কোনো সময়েই এক রাজশক্তির অধীনে আসে নি। এবং কোনো সাম্রাজ্যই বিশেষ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কুশান সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং হর্ষের সাম্রাজ্য—প্রত্যেকটিই ছিল উত্তর ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলের মধ্যে কমবেশী সীমাবদ্ধ। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যকে সাময়িকভাবে তাঁর শাসনাধীন করেন বটে, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সে-সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। আকবর থেকে আওরঙ্গজেব—এই চার পুরুষে ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চল মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়, কিন্তু শেষোক্ত সম্রাটের মৃত্যুর বেশ কিছুকাল আগে থেকেই সে-সাম্রাজ্য ভাঙতে শুরু করে। ক্লাইভ থেকে ডালহাউসি—এই এক শো বছরের মধ্যে ভারত উপমহাদেশ ইংরেজের অধিকারে আসে, কিন্তু ইংরেজরাও এই উপমহাদেশকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রত্যক্ষ-শাসিত এবং রাজন্যশাসিত অংশের মধ্যে পৃথক করে রাখেন। ১৯৪৭ সালে আপসে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে

এই উপমহাদেশের এক অংশের নাম রইল ইণ্ডিয়া অন্য দুই অংশের নাম হল পাকিস্তান। আর পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে "বাংলাদেশ"-এর প্রতিষ্ঠা তো সেদিন আমাদের চোখের সামনে ঘটল।

এখন এই ঘটনাপ্রবাহ থেকে এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রিক ইতিহাসের যে ছবি পাওয়া যায় তা থেকে অন্তত এটুকু পরিস্ফুট যে রাষ্ট্রিক সীমার ভিত্তিতে ভারতীয়ত্বের অনুসন্ধান নিতান্তই পণ্ডশ্রম[১]। তবে কোন্ পথে এই জিজ্ঞাসার পরিচালনায় প্রতিশ্রুতি বর্তমান? সে কি ভাবরূপের পথ? সে কি অস্তিত্ববিচারের পথ?

দুই

ভাবরূপের কথাই প্রথমে আলোচনা করা যাক। রূপ নানা ধরনের হতে পারে। এক ধরনের রূপ আছে যার মানসিক ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব অনাবশ্যক, যা শুদ্ধ, বিমূর্ত এবং স্বতঃসিদ্ধ, যার প্রধান উদাহরণ গাণিতিক রূপাদি। আরেক ধরনের রূপ আছে যার বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহির্জগৎ থেকে সংগৃহীত, কিন্তু সেইসব প্রত্যঙ্গ কল্পনায় এমনভাবে সংযুত হয়েছে যে বাইরের জগতে সেই সংযুতির প্রতিষঙ্গ মেলে না—যেমন পক্ষীরাজ ঘোড়া, নরসিংহ বা গণেশ প্রভৃতি। প্রকৃতিতে প্রত্যেক বস্তু এবং ব্যক্তির নিজস্ব বিশেষ রূপ আছে, এবং প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে আমরা উদ্দিষ্ট বিশেষ এবং তার প্রতিরূপের মধ্যে সংগত কারণেই সাদৃশ্য দাবি করি। এখানেও বিমূর্তনের প্রশ্ন আছে, কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত অপ্রধান।

প্রতিষঙ্গ এবং বিমূর্তনের সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে ভাবরূপের ক্ষেত্রে। ভাবরূপ মুখ্যত দেখা দেয় যখন অনেক বিশেষের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করে আমরা গণগত বা জাতিগত রূপ কল্পনা করার প্রয়াস পাই। একটি বিশেষ মানুষের প্রতিকৃতি আঁকা এক ব্যাপার, আর মানুষ নামক প্রজাতির রূপ কল্পনা করা অন্য ব্যাপার। শেষেরটি ভাবরূপ, এবং এটির উদ্ভবে একদিকে যেমন বিমূর্তনের প্রক্রিয়া স্পষ্ট, অন্যদিকে তেমনি সাদৃশ্যের যাথার্থ্য একটি অবম শর্ত। অর্থাৎ মানুষের ভাবরূপ যেমন একটি বিশেষ মানুষের প্রতিকৃতি নয়, তেমনি সেটি এমন রূপ হওয়া দরকার যাকে মানুষ বলে চিনতে কোনো সংশয়ের কারণ ঘটে না।

কিন্তু ভাবরূপ যাঁরা কল্পনা করেন তাঁরা অনেক সময়েই শ্রমসাধ্য

আরোহী পদ্ধতিতে বীতশ্রদ্ধ অথবা পরাঙ্মুখ। তাঁরা ভাবরূপ হিসেবে যাকে উপস্থিত করেন প্রায়শই তা আসলে তাঁদের পরিকল্পিত আদর্শ-রূপ। আদর্শকে স্রেফ আদর্শ বললে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু ভাবুকরা যখন তাতে খুশি না হয়ে আদর্শকে বাস্তবের বিমূর্ত প্রতিরূপ বলে দাবি করেন তখনি মুসকিল বাধে। ইংরেজীতে "আই-ডিয়া"-র সঙ্গে "আইডিয়াল"-কে গুলিয়ে ফেলার দৃষ্টান্ত তুর্লভ নয়। ভারতবর্ষ-বিষয়ক আলোচনায় আদর্শরূপে ভাবরূপের অধ্যাসন তার চাইতে অনেক বেশি সুলভ।

ইংরেজ আমলের আগে এই উপমহাদেশবাসীরা ভারতবর্ষের কোনো ভাবরূপ কল্পনা করেছিলেন কি না বলা শক্ত, করে থাকলেও তার উদাহরণ আমার জানা নেই। ভরতের সন্তানদের বাসভূমি থেকে ভারতবর্ষ, অথবা জামেব দেশ বলে জম্বুদ্বীপ, এইসব নামকরণের পুরাণবর্ণিত কাহিনী থেকে ভাবরূপের হদিস মেলে না। কোনো কাহিনী অনুসারে এই ভারতবর্ষের প্রসার লক্ষ যোজন। কোনো কাহিনী অনুসারে মেরুপর্বতকে ঘিরে অঙ্গুরীয়ের মতো সাতটি মহাদেশের একটি হল জম্বুদ্বীপ। প্রত্যেকটি মহাদেশকে ঘিরে একটি করে মহা-সমুদ্র ; সাতটি মহাসমুদ্রের পর্যায়ক্রমে উপাদান হল নুন, গুড়, মাধ্বী, ঘি, তুধ, দই এবং বিশুদ্ধ জল। অবশ্য এইসব আজগুবী কল্পনা থেকে এ সিদ্ধান্ত অসংগত যে পুরাকালে এদেশের ভাবুকরা বৈজ্ঞানিক বিচারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ছিলেন ; পৃথিবীর পরিধি সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্তের হিসাব তো রীতিমত বিস্ময়কর[২]। তবু লক্ষ না করে উপায় নেই যে প্রাগাধুনিক যুগের ভারতবর্ষের ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য আমরা বিদেশাগত কৌতূহলী লেখকদের রচনাবলীর উপরে অনেকখানি নির্ভরশীল। তীর্থযাত্রীরা নিশ্চয়ই এদেশের পথঘাটের খবর রাখতেন, বণিক ব্যবসায়ীরা সমুদ্রপথেও যাতায়াত করতেন। কিন্তু এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে সেই ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রায় কোনো বিবরণই তাঁরা রেখে যান নি। সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাসের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করে রমেশচন্দ্র মজুমদার সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী' ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যে দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ মেলে না যাকে প্রকৃত অর্থে ইতিহাস বলা চলে[৩]। অপরপক্ষে মেগাস্থেনিস, ফা-হিয়েন, হুয়েন্‌ত্‌ সাঙ্‌ থেকে আল্‌বেরুনী, ইব্‌ন্‌ বাতুতা, চাঙ্‌-হো, বোর্নিয়ের প্রমুখ ভিন্‌দেশীরা এদেশের যেসব বিবরণ

রেখে গেছেন যে কোনো হিসেবেই তারা বিশেষ মূল্যবান।

কিন্তু উনিশ-শতকের গোড়া থেকে দেখা যায় ভারতীয় ভাবুকদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু ইতিহাস চর্চা শুরু করেন নি, তাঁদের মধ্যে দু'চারজন ভারতের ভাবরূপ কল্পনারও প্রয়াস পেয়েছেন। অন্য আরো অনেক ক্ষেত্রের মতো এখানেও রামমোহন রায়কে পথিকৃৎ বলা সংগত। আমরা জানি যে তিনি ইসলাম, ইহুদিধর্ম, খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, এবং তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা করেছিলেন; এদেশে নব্য ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের অনুশীলনে এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনে তাঁর উদ্যোগ সু-প্রসিদ্ধ; কিন্তু ভারতবর্ষের যে ভাবরূপ তিনি কল্পনা করেন তার প্রধান উৎস হল বেদের ব্রাহ্মণভাগের শেষ অংশ, অর্থাৎ উপনিষদ্। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনাকে তিনি শুধু ধর্মীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থিত করেন নি; তাঁর বিচারে এই ব্রহ্মই বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের মূল প্রত্যয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের আদিসূত্র; পরবর্তীকালে হিন্দুদের মধ্যে বহু দেবদেবীর পূজা ইত্যাদি আসলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আপজাত্যের ফল। এই যুক্তির দ্বারা তিনি মিশনারীদের আক্রমণ, উপযোগবাদীদের উপেক্ষা, এবং রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিতদের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ভাবতবর্ষের একটি ভাবরূপ কল্পনা করেছিলেন, ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টাও যা থেকে প্রেরণা পেতে পারে। ফলত তাঁর চিন্তায় ভাবরূপ এবং আদর্শরূপ পৃথক হয় নি; এবং পরবর্তী অধিকাংশ হিন্দু ভাবুকদের চিন্তা এই জাতীয় সদুদ্দেশ্যের দ্বারা অনু-প্রেরিত, কিন্তু যুক্তির বিচারে অসংগত সহব্যাপ্তির দ্বারা চিহ্নিত।

রামমোহনের পরে স্বতন্ত্র পথে দয়ানন্দ সরস্বতী যে ভাবাদর্শ উপস্থিত করেন তাতে ভারতবর্ষ প্রতিভাত হল আর্যভূমি রূপে, এবং তার উৎস হল অপৌরুষেয় চতুর্বেদ। তাঁর বিচারেও ভারতবর্ষের মূল সাধনা একেশ্বর-বাদ এবং প্রতিমাপূজা আপজাত্যের লক্ষণমাত্র[৪]। এঁদের সঙ্গে তুলনায় বঙ্কিমের পরিকল্পিত ভাবরূপ অনেকটা জটিল, বিচিত্র এবং স্ববিরোধী। তিনি একদিকে ভারতবর্ষের আদর্শ খুঁজলেন গীতার মধ্যে; অন্যদিকে বাংলাদেশের শক্তি সাধনার সূত্রে তিনি দেশকে কল্পনা করলেন মাতৃদেবী রূপে; আবার পশ্চিমী র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারার প্রভাবে তিনি এদেশের অত্যাচারিত এবং অবহেলিত চাষীদের প্রতিও শিক্ষিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন[৫]। বঙ্কিমের মতো বিশ্লেষণ শক্তি বা সৃষ্টি প্রতিভা বিবেকানন্দের ছিল না; কিন্তু উদ্দীপনা

এবং সংগঠনশক্তির সামর্থ্যে যে ভাবাদর্শকে তিনি শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন তার সঙ্গে বঙ্কিমী মিশ্রকল্পনার অনেকটা সাযুজ্য দেখা যায়। আবার গীতার শ্রীকৃষ্ণ এবং মহারাষ্ট্রের শিবাজীকে মিশিয়ে বালগঙ্গাধর তিলক যে ভাবাদর্শ উপস্থাপিত করলেন জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের উপরে তার প্রভাবও নিতান্ত কম পড়ে নি। অপর পক্ষে অরবিন্দ ঘোষ তাঁর প্রথম যুগের রচনা "প্রাচীন দীপাবলীর বদলে নবীন দীপাবলী"-তে বারবার সর্বহারা বা "প্রলেটারিয়েটের" বৈপ্লবিক শক্তির উল্লেখ করলেও জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ও নেতা হিসেবে তিনি ভারতবর্ষকে ভবানী রূপেই কল্পনা করেন[৬]। এঁদের পরে এলেন গান্ধী। তাঁর কল্পনায় ভারতবর্ষ প্রতিভাত হল রামরাজ্য রূপে, যে রামরাজ্যের ধর্ম ভক্তি এবং অহিংসা, এবং যে রামরাজ্যে নগর-সভ্যতা, ইন্দ্রিয়সম্ভোগ, বিজ্ঞানচর্চা এবং যন্ত্রশিল্প নৈতিক কারণে বর্জনীয়।

ভাবরূপের পরাকাষ্ঠা দেখি রবীন্দ্রনাথে। মহাপ্রতিভাধর এই পুরুষের সৃজনশীল দীর্ঘ জীবনে তাঁর পরিকল্পিত ভাবরূপে স্বভাবতই নানা সূক্ষ্ম এবং অর্থপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে—ভারতীয়ত্বের মধ্যে তিনি ক্রমেই স্পষ্টতরভাবে বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন; উদ্‌-বংশীয় ব্রাহ্মণের আদিরূপ থেকে প্রসার খুঁজেছেন ব্রাত্য লোকসংস্কৃতির প্রকরণে; ব্রাহ্ম সাধনাকে পরিহার না করেও কবিকল্পনায় প্রাধান্য দিয়েছেন নটরাজ শিব এবং প্রেমিক কৃষ্ণকে; আর সবচাইতে বড় কথা, ঐক্যের মধ্যে তিনি দেখেছেন বৈচিত্র্যকে। তা সত্ত্বেও তাঁর পরিকল্পিত ভারতীয়ত্বের ভাবরূপের মূল বৈশিষ্ট্য হল বহুর মধ্যে একের সাধনা, এবং ঔপনিষদিক পরিজ্ঞানের ভিতরেই তিনি ঐক্যের আদিসূত্র নির্ণয় করেছেন। প্রতিমা-বিরোধিতার সম্প্রচারে বিশেষ আকৃষ্ট বোধ না করলেও ভারতীয়ত্বের কেন্দ্রে উপনিষদকে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি রামমোহনেরই অন্যতম উত্তরসাধক।

এখন এইসব ভাবরূপের নিশ্চয়ই মূল্য আছে এবং ভারতবর্ষের কোনো না কোনো দিক অবশ্যই এদের মধ্যে ধরা পড়েছে। কিন্তু যেসব দিক ধরা পড়ে নি তারা কি সে-কারণে কম অপ্রত্যক্ষ অথবা অপ্রধান? এই উপমহাদেশের যাঁরা আদিবাসী, পণ্ডিতরা যাঁদের নামকরণ করেছেন নিষাদ বা অস্ট্রো-এসিয়াটিক, সাধারণ্যে যাঁরা কোল বা মুণ্ডা ভাষাভাষী বলে পরিচিত, সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে তাঁরা

মোটেই নগণ্য নন। কিন্তু এইসব ভাবরূপে তাঁদের স্থান কোথায়? নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের অধ্যবসায়ের ফলে সম্প্রতিকালে এঁদের বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু শিক্ষিতজনের মনে যেসব ভাবরূপ মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত তাদের উপরে এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রভাব কতটুকু? অথবা এঁদের চাইতেও সংখ্যার দিক থেকে যাঁরা বেশি, হিন্দুসমাজ যাঁদের অসৎশূদ্র, অস্পৃশ্য বা পতিত বিবেচনা করে এসেছেন, উপরোক্ত নানা ভাবরূপে তাঁদের অস্তিত্বের প্রতিফলন কি-ভাবে ঘটেছে? গান্ধী এঁদের "হরিজন" আখ্যা দিয়ে এঁদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন; রবীন্দ্রনাথের লেখায় ব্রাত্যদের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা নিঃসংশয়ে ঘোষিত; কিন্তু এই নিষাদ এবং অস্পৃশ্যজনদের স্বকীয় সমাজসংস্কৃতি, ধ্যানধারণা, শিল্পসাহিত্য, আচার-আচরণ কি গান্ধী অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাবরূপে প্রতিফলিত? এঁদের মধ্যে মদমাংসের ব্যবহার, যৌন এবং বৈবাহিক জীবনের রীতিনীতি, এঁদের ধর্মীয় এবং নৈতিক বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মাদি কি ঔপনিষদিক অথবা তুলসীদাসী ভাবরূপে উপযোজিত? বস্তুত গান্ধী, এমনকি রবীন্দ্রনাথ, এঁদের উপরে নিজেদের কল্পিত হিন্দু আদর্শই চাপানোর কথা ভেবেছেন, এঁদেব স্বতন্ত্র জীবনযাত্রার ধরনটি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন হিন্দু আদর্শই শ্রেষ্ঠ—সেটি প্রাচীন ঔপনিষদিক হোক বা মধ্যযুগীয় ভক্তিমার্গই হোক।

মহারাষ্ট্রের বাইরে যাঁরা বাস করেন তাঁদের অনেকেরই সম্ভবত জানা নেই যে দয়ানন্দের সমকালীন একজন ভারতীয় ভাবুক-সংস্কারক এদেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির এমন একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যা রামমোহন-দয়ানন্দ-বঙ্কিম-তিলকের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ভাবুকটির নাম যতিরাও ফুলে (১৮২৭-১৮৯০)। আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু তর্কতীর্থ লক্ষণ শাস্ত্রী যোশী আমাকে ফুলের জীবনী এবং রচনাবলীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত করেন। পরে আমার সম্পাদিত একটি সংকলন গ্রন্থে ফুলে সম্পর্কে তিনি একটি নিবন্ধ লেখেন[৭]। ধনঞ্জয় কীর প্রণীত ফুলের পূর্ণাঙ্গ জীবনীটি তার পরে প্রকাশিত হয়[৮]। জাতিতে ফুলে ছিলেন মালী। ব্রাহ্মণশাসিত মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুসমাজে এটি নিতান্ত নীচ জাতি হিসেবে গণ্য হ'ত। যতিরাও-র বাবার ফুলের দোকান ছিল। তিনি ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে পড়াবাব ব্যবস্থা করেন এবং স্কুলের শিক্ষা শেষ করার পর যতি সরকারী চাকরীর চেষ্টা না

করে নীচুজাতির মেয়েদের জন্য নিজেই একটি স্কুল খোলেন। তারপর থেকে শেষ-জীবন পর্যন্ত নীচুজাতি এবং স্ত্রীলোকদের জন্য সংগ্রাম করাই ছিল তাঁর মুখ্য ব্রত।

ফুলের বিভিন্ন রচনার মধ্যে সব চাইতে উল্লেখ্য হচ্ছে তাঁর "গোলামগিরি" গ্রন্থ। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত এই বইটির ইংরেজীতে পুরো নাম হচ্ছে *Slavery within the Indian Empire under the cloak of Brahminism.* বইটি ষোলটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং তার উৎসর্গপত্রে ঘোষিত হয়েছে যে মার্কিন দেশে নিগ্রোদের মুক্তির জন্য যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁদের উদাহরণ থেকে ভারতবর্ষের শূদ্ররাও ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার থেকে মুক্তিপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হবেন এই আশায় বইটি রচিত[৯]। ছাত্রাবস্থায় ফুলে টম পেইন-এর "রাইট্স্ অব ম্যান" বইটি পড়ে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের ডিরোজিও-শিষ্যদের তুলনায় তাঁর উপরে সেই প্রভাব অনেক বেশি স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হয়েছিল। তাঁর জীবনে এবং রচনায় এই প্রভাব প্রত্যক্ষ।

'গোলামগিরি' গ্রন্থের প্রথম নয়টি পরিচ্ছেদে ফুলে ভারতীয় ইতিহাসের নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন[১০]। অতি সংক্ষেপে বলা যায় তাঁর বিচার অনুসারে বিদেশাগত ব্রাহ্মণ এবং এই উপমহাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রামই ভারতীয় ইতিহাসের মূল সূত্র। তাঁর মতে এই আদিবাসীরাই ছিলেন আসলে ক্ষত্রিয়; তাঁদের স্বাধীন যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রধান রাষ্ট্রনেতা ছিলেন সম্রাট বলি। তিনি ধীর, স্থির, উদার, সাহসী, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। বহিরাগত ব্রাহ্মণদের নেতা ছিলেন বামন; এঁকে বলা হ'ত দেবতা বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। ইনি ছিলেন চতুর, অসৎ, ষড়যন্ত্রধারী। বামনের সঙ্গে যুদ্ধে বলির মৃত্যু ঘটে (ত্রিপাদ ভূমির গল্প ফুলে গ্রহণ করেন নি)। পরে বিষ্ণুর তথাকথিত ষষ্ঠ এবং হিংস্রতম অবতার পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের ব্যাপকভাবে হত্যা করেন। ব্রাহ্মণরা ছলে-বলে-কৌশলে আদিবাসী ক্ষত্রিয়দের পরাজিত করে তাদের শূদ্র এবং অতিশূদ্র জাতিতে বিভক্ত করেন। আর্থিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিবিধ ধর্মশাস্ত্র, বিধিনিষেধ, আচার আচরণ প্রণালী উদ্ভাবিত হয়। ফুলের মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব চাইতে বিবেকবিরোধী বই হল "মনুস্মৃতি"। মুসলমান

অথবা ইংরেজ কেউই এ পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্য ভাঙতে পারেন নি। এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে বারবার ভারতবর্ষে আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের শাঠ্য সেইসব আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদে বিশ্বাস এবং জাতিভেদ ব্যবস্থার মধ্যে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। ফুলে পরে বর্ণনা করে দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষে অতিশূদ্রদের অবস্থা মার্কিন দেশের নিগ্রোদের চাইতেও খারাপ বই ভালো নয়। সাম্যের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ফুলে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৪ সেপ্টেম্বর পুণাতে 'সত্য-শোধক-সমাজ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিকরা ব্রাহ্মসমাজ এবং আর্যসমাজকে মূল্য দিলেও সত্য-শোধক-সমাজকে নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা করেন নি। অথচ ফুলের রচনা এবং উদ্যোগ থেকেই আম্বেদকর প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে আম্বেদকরের ভূমিকা মোটেই অপ্রধান নয়।

ফুলের ইতিহাস-ব্যাখ্যাকে গ্রহণ না করেও একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে তাঁর রচনা এবং উদ্যোগের মধ্যে ভারতবর্ষের এমন একটি উল্লেখ্য দিক আত্মপ্রকাশ করেছে যা তথাকথিত ভারতীয় রেনেসাঁসের অন্য প্রবক্তাদের ভাবরূপে হয় অনুক্ত নয় অস্পষ্ট। পরবর্তীকালে ফুলের চিন্তার দ্বারা শুধু আম্বেদকরই উদ্বুদ্ধ হন নি; দক্ষিণ ভারতে রামস্বামী নাইকার এবং রমানাথন যে প্রবল ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন তার সঙ্গেও ফুলের ভাবধারার সাযুজ্য লক্ষণীয়। তাঁরা এই আন্দোলনের নামকরণ করেছিলেন 'সেল্‌ফ্‌ রেস্‌পেক্ট' বা আত্মমর্যাদা বা "সুয়মর্যাতাই ইয়কৃকম"; এই আন্দোলনের তামিলভাষী সাপ্তাহিক মুখপত্রেব নাম ছিল "রিভোলৃট্‌"[১১]। আমার যৌবনকালে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সূত্রে নাইকার এবং রমানাথন উভয়ের সঙ্গেই পরিচয়ের সুযোগ ঘটে, এবং তাঁদের চোখ দিয়ে এই উপমহাদেশের যে দিকটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় উপনিষদ, গীতা বা রামায়ণে তার যথার্থ নির্দেশ মেলে না।

ফুলের মতোই নাইকার এবং রমানাথন ছিলেন যুক্তিবাদী র‍্যাডিক্যাল; কিন্তু শাস্ত্র এবং ব্রাহ্মণবিরোধীতা ছাড়াও আরেকটি দিকে তাঁরা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উনিশ-শতকে এবং বিশ শতকেও ভারতবর্ষের ভাবরূপ যাঁরা কল্পনা করেছিলেন দক্ষিণ ভারতের দ্রবিড়

ভাষা, সংস্কৃতি এবং বিচিত্র সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল হয় নিতান্ত সীমাবদ্ধ, নয়তো একেবারেই অনুপস্থিত। বস্তুত ভারতবর্ষের জীবিত ভাষাদের মধ্যে যেটি সব চাইতে প্রবীণ সেই তামিলে রচিত প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যের অনুবাদ ইংরেজীতে অথবা উত্তর ভারতের ভাষাগুলিতে বিশেষ হয় নি। উত্তর ভারতের শিক্ষিত লোক দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রিক ইতিহাসের যদিবা কিছু কিছু খবর রাখেন সেখানকার সমাজ-সংগঠন এবং মানস-বিবর্তনের বিষয়ে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞ। দয়ানন্দের আর্যসমাজ এবং গান্ধীর রামরাজ্য দক্ষিণের বিশেষত অব্রাহ্মণদের মনে কী প্রতিন্যাসের উদ্দীপন ঘটায়? সীতার প্রশ্নহীন পাতিব্রত্য কেরলকন্যারা কীভাবে গ্রহণ করেছেন? রাম এবং রাবণ সম্পর্কে মাইকেল মধুসূদনের মনোভাবের উপরে তাঁর মাদ্রাজ প্রবাসের প্রভাব কতখানি?

শুধু আদিবাসী, অচ্ছুত এবং দ্রবিড়রাই নন, ভারতবর্ষের যে বিরাট জনসমষ্টি ইসলামধর্মী পূর্বোক্ত বিভিন্ন ভাবরূপে তাঁরাই বা স্বীকৃতি পেয়েছেন কতটুকু এবং কীভাবে? রামমোহন সংস্কৃতের সঙ্গে সমান যত্ন নিয়ে আরবী-ফারসী শিখেছিলেন; তাঁর লেখা প্রথম যে পুস্তিকাটি পাওয়া গেছে সেই 'তুহ্‌ফাত-উল্‌-মুওয়াহ্‌হিদিন'-এর ভূমিকা আরবীতে এবং বাকী অংশ ফারসীতে লেখা; কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই লেখাটির উপরে মু'তাজিলি ভাবধারার কিছুটা প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তা মুখ্যত উপনিষদের ভিত্তিতেই আকার পেয়েছে এবং তাঁর প্রকাশিত অন্যতম পত্রিকার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন'। তবু রামমোহন ইসলামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চর্চা করেছিলেন, কিন্তু দয়ানন্দ, বঙ্কিম, তিলক, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, মায় গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই চর্চারও বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় না।

অথচ শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয় ইতিহাসের দিক থেকেও ইসলামকে অবহেলা করে ভারতীয়ত্বের অনুধাবন কি নিতান্ত অবাস্তব নয়? শুধু উত্তর ভারতে নয়, দক্ষিণ ভারতেরও কিছু অংশে কী সংগীতে, সাহিত্যে, কী স্থাপত্যে, চিত্রকলায়, কী ধর্মবিশ্বাসে সমাজ সংগঠনে, কী রাষ্ট্রিক-আর্থিক বিন্যাসে ইসলাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার ছাপ ফেলেছে। ভারতীয় অন্য সব-কিছুর মতোই ভারতীয় মুসলমান সমাজও বিচিত্র এবং বহুবিভক্ত, কিন্তু উনিশ-শতকের শেষার্ধ থেকে

তাঁদের মধ্যেও ভাবরূপ কল্পনার চেষ্টা শুরু হয়েছে। হিন্দু ভাবুকরা সেই চেষ্টাকে বোঝবার প্রয়াস না পেয়ে তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য এবং বিভাগ ছাড়াও অন্য আরেকটি বড় সমস্যা ছিল, এবং এখনো আছে। হিন্দুধর্মের মতো ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত এই ধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। ফলে মুখ্যত কোনো ভৌগোলিক দেশ বা উপমহাদেশের দ্বারা আপনাকে চিহ্নিত করার পথে মুসলমানদের মনে দ্বিধা অস্বাভাবিক নয়; এবং যেখানে তাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানে এই দ্বিধা প্রবলতর হয়েছে। দেওবন্দ্ এবং আলীগড়ের বিরোধের অন্তত একটি দিক এই সমস্যার দ্বারা চিহ্নিত, এবং ইকবালের লেখার মধ্যে এই দ্বিধা মোটেই অস্পষ্ট নয়। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দুদের অধিকাংশই না চেষ্টা করেছেন তাঁদের ভারতীয়ত্বের ভাবরূপে ইসলামকে স্থান দিতে, না তাঁরা করেছেন ভারতীয় মুসলমানের দ্বিধা ও সমস্যাকে যথার্থ সহানুভূতি অথবা বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝতে[১২]। এখনো পর্যন্ত বেশির ভাগ শিক্ষিত হিন্দুই স্বীকার করতে গররাজী যে এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রিক বিভাগের জন্য যদি ইংরেজ সরকার এবং জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বকে দায়ী করতেই হয় তবে সেই যুক্তিকে গান্ধী, প্যাটেল এবং নেহরুকেও দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না।

ফলত ভাবরূপের পথে গেলে প্রতি ক্ষেত্রেই অন্তত দুটি প্রধান গলদ চোখে পড়ে। প্রথমত ভাবরূপের নামে যাকে উপস্থিত করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে প্রবক্তাদের কল্পিত আদর্শরূপ; সেইসব আদর্শের নিজস্ব আবেদন থাকলেও তাদের মধ্যে এই উপমহাদেশের নির্ভরযোগ্য সামগ্রিক কোনো প্রতিফলন ঘটে নি। দ্বিতীয় গলদ প্রথমটির ফল। ভাবুকরা এই উপমহাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সংস্কৃতি থেকে নিজেদের আদর্শ অনুসারে কোনো কোনো দিক বেছে নিয়ে তাদের উপরেই একান্তভাবে ঝোঁক দিয়েছেন; অন্য দিকগুলি হয় তাঁরা দেখেন নি, অথবা দেখেও তাঁদের কল্পিত রূপ থেকে বাদ দিয়েছেন। এইসব রূপ সাময়িকভাবে রাজনৈতিক নেতাদের কাজে লাগতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসুদের পিপাসা মেটায় না। এবং সেই কারণেই উত্তরের কোনো প্রত্যাভূতি না থাকা সত্ত্বেও অস্তিত্ববিচারের পথে পা বাড়ানো ছাড়া উপায়ান্তর দেখি না।

তিন

অস্তিত্ববিচারের মূল অভ্যুপগম হল যে যা-কিছু ছিল কিংবা আছে তাদের থাকাটা মানুষের জানার উপরে নির্ভর করে না, কিন্তু আমাদের জানার যাথার্থ্য নির্ভর করে থাকা এবং জানার মধ্যে সংগতির উপরে। অর্থাৎ অস্তিত্বের আদ্যতা ও স্বতঃসিদ্ধতা অস্তিত্ববিচারের মুখ্য প্রকল্প, এবং অস্তিত্ব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও সন্নদ্ধ ধারণাবলী উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টাসূত্রে বিবিধ বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। এইসব ধারণার কিছুটা উপাদান আমরা সংগ্রহ করি আপন-আপন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে, অনেকটাই আসে দীর্ঘকালব্যাপী বহু জিজ্ঞাসুর অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ, প্রমাণ-অপ্রমাণাদির ভিতর দিয়ে।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা আপাতত বাদ দিয়ে এই উপমহাদেশ সম্পর্কে অন্য অন্বেষ্টাদের উপগম নিয়ে দু'একটি কথা পেশ করা যেতে পারে। আরোহী প্রক্রিয়ার অন্তত দুটি প্রধান অঙ্গ দেখতে পাই— একটি কালক্রমের অর্থাৎ ঐতিহাসিক, অন্যটি স্থাননির্ভর অর্থাৎ ভৌগোলিক। বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এদের পৃথক করে দেখলেও অস্তিত্বের হিসেবে এরা অবশ্যই পরস্পরে অন্বিত। এই উপমহাদেশে সভ্যতার ইতিহাস অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে শুরু হয়েছে, কিন্তু সেই ঐতিহাসিক উপাত্তের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং বিচার-বিশ্লেষণের বয়স দুশো বছরের বেশি নয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকে সংগত কারণেই ভারতবর্ষীয় ইতিহাসবিজ্ঞানের সূচক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। উনিশ-শতকে জেম্‌স্ মিল কিংবা কার্ল মার্কস-এর মতো কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি এই উপমহাদেশে না এসেও এ-সম্পর্কে লিখেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের বাদ দিলে উইলিয়ম জোন্‌স্-এর সময় থেকে বেশির ভাগ গবেষকই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং/অথবা জীবনব্যাপী অনুসন্ধানের ভিত্তিতে আরোহী ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং বিন্যাসের প্রয়াস করে এসেছেন। অন্যদিকে স্থানীয় সমাজ-সংস্কৃতি এবং সমকালীন জীবনযাত্রার উপাত্তনির্ণয় ও ব্যাখ্যা ভৌগোলিক অক্ষের অন্তর্গত ; এবং পর্যটকদের বিবরণ যতো মূল্যবানই হোক না কেন এক্ষেত্রে সুসম্বদ্ধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বয়সের হিসাবে ঐতিহাসিক গবেষণার চাইতেও অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। তবে বর্তমান শতকে এবং বিশেষ করে গত পঁচিশ-তিরিশ বছরে নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজবিজ্ঞানীদের তন্মনস্ক অধ্যবসায়ের ফলে এই উপমহাদেশের

অনেক গ্রাম, নগর, অঞ্চল, প্রতিষ্ঠান; জাতি-উপজাতি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, এবং ফলে এখানকার মানবীয় মানচিত্রে আগের চাইতে কিছুটা স্পষ্টতা এবং নির্ভরযোগ্যতা লক্ষণীয়।

এখন ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক উপাত্তের হিসেবে এই উপমহাদেশে একদিকে যেমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরম্পরা এবং কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের উপস্থিতি দেখা যায় অন্যদিকে তেমনি অবচ্ছেদ, বৈসাদৃশ্য, এবং বৈপরীত্যের উপস্থিতি কি অন্তত সমানভাবেই প্রকট নয়? প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধান থেকে আমরা জানি এদেশে আর্য নামে খ্যাত গোষ্ঠীদের প্রবেশের আগেই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং কয়েক শো বছর ধরে গড়ে ওঠা সেই সভ্যতা শুধুমাত্র হরপ্পা এবং মোহেন্‌জোদারোতে সীমাবদ্ধ ছিল না[১৩]। এই নগরদের পূর্বে এবং সমকালে আশেপাশে বিস্তর গ্রাম ছিল। কিন্তু যে অবচ্ছেদের ব্যাখ্যা আমরা জানি না তা হল এই উপমহাদেশের দীর্ঘ ইতিহাসে পরবর্তীকালে হরপ্পা-জাতীয় সুপরিকল্পিত নগরীর ঐতিহ্য কেন অনুপস্থিত। বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান-ব্রিটিশ আমলেও এই উপমহাদেশে নানা নগর গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই পরে লোপ পেয়েছে, কিন্তু হরপ্পা ধরনের শহর আর চোখে পড়ে না। অন্যদিকে বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের ঘরবাড়ির বিশেষ করে মন্দিরের এবং গুম্ফার দেওয়ালে অজস্র মূর্তি দেখা যায়; কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার প্রাচীর প্রাকার নিতান্ত প্রায়োগিক এবং মূর্তিবিহীন। এখনো পর্যন্ত লিপিভেদ না করতে পারার ফলে সিন্ধু-সভ্যতার মানসজগৎ আমাদের কাছে অনেকটা অগম রয়ে গেছে, কিন্তু নামমুদ্রায় বা সীল্‌-এ যেসব বিচিত্র আকৃতি দেখা যায় প্রাচীর গাত্রে তাদের অনুপস্থিতি বিস্ময়কর।

সিন্ধু-সভ্যতার ভিতর থেকে কোনো বিবর্তনমুখী শক্তি ঐ সভ্যতাকে কোনো উন্নততর স্তরে নিয়ে যায় নি। আর্যগোষ্ঠীরা বহিরাগত; তাঁরা জবরদস্তি করে নতুন নতুন অঞ্চল দখল করেছিলেন; অনার্যদের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা তাঁরা নিজেরাই বিবৃত করে গেছেন। তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন এক মহাসম্পন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি; বৈদিক ভাষা ও কল্পনার ঐশ্বর্য আজও আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু আর্যদের কল্পনায় যাঁরা মুখ্যদেবতা হিসেবে বন্দিত সেই ইন্দ্র এবং বরুণ পরবর্তীকালে তাঁদের প্রতিপত্তি কেমন করেই বা হারালেন, আর যাঁদের হিন্দু বলা হয় তাঁদের মধ্যে লিঙ্গদেব, শক্তিদেবী এবং প্রেমিক কৃষ্ণের

পূজাই বা কবে এবং কীভাবে প্রধান হয়ে উঠল? আর্যরা মূর্তিপূজা করতেন না ; অদিতি, রাত্রি, পৃথ্বী, উষস্ প্রভৃতির উল্লেখ থাকলেও তাঁদের প্রধান দেবতারা পুরুষ ; সোমরস এবং গোমাংসে তাঁদের অরুচি ছিল না ; অনার্যদের মধ্যে শিশ্ন এবং যোনির পূজাপ্রকরণ দেখে তাঁরা নাক সেঁটকাতেন ; স্থানীয় কালো চামড়ার মানুষদের তাঁরা 'দাস' নামে ডাকতেন। সিন্ধু-সভ্যতায় লিঙ্গ এবং যোনির প্রচুর প্রতি-রূপ চোখে পড়ে ; মাতৃমূর্তির সংখ্যাও সেখানে কম নয় ; সেখানকার বিভিন্ন সীল-এ যোগী, বৃষ, হস্তী, সর্প ইত্যাদির রূপ উৎকীর্ণ ; হরপ্পার নর্তক এবং মোহেন্‌জোদারোর নর্তকী-মূর্তি সুপ্রসিদ্ধ। এসব থেকে অনেকে অনুমান করেছেন যে পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে আর্যের চাইতে প্রাক্-আর্য উপাদান বেশি প্রবল। হয়তো তাই, কিছু অনুমান এক ব্যাপার আর ঐতিহাসিক পরম্পরার উপাত্ত সংগ্রহ করে সেই অনুমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অন্য ব্যাপার। অবতারবাদের সূত্রে বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণকে গাঁথা যায় ; শতনামের সূত্রে রুদ্র এবং নটরাজ, যোগী, প্রেমিক, এবং পশুপতিকে একই দেবতার নানারূপ হিসেবে ভাবা যায় ; কিন্তু এইসব রূপের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ বৈপরীত্য বর্তমান তা-ও যেমন এর ফলে অপ্রমাণিত হয় না, তেমনি কবে কীভাবে হরপ্পা-সভ্যতা অথবা তার চাইতেও প্রাচীন এবং ব্যাপক আদিবাসী-সভ্যতা আর্যসভ্যতার উপরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, তারও তথ্যসমর্থিত ব্যাখ্যা মেলে না। অথর্ব বেদে যেসব "ব্রাত্য" পুরোহিতের উল্লেখ পাওয়া যায় কোনো কোনো ঐতিহাসিকের প্রকল্প অনুসারে তাঁদের মাধ্যমে বহু অনার্য ধ্যানধারণা, বিধিপ্রকরণ আর্যসভ্যতায় অভিযোজিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত এই "ব্রাত্য" পুরোহিতদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি এতই কম যে তার ভিত্তিতে এই প্রকল্প না হয় প্রমাণিত না হয় অপ্রমাণিত[১৪]।

ভারতীয়ত্ব, বিশেষ করে হিন্দুত্ব, অনেক পণ্ডিতের মতে মূলত দুঃখবাদী। এখন গত দুশো বছরের ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ-মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে যাঁদের কমবেশী পরিচয় আছে তাঁদের পক্ষে বোঝা কিছুমাত্র কঠিন নয় অন্তত ঐ সময়ে এই উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রতিন্যাসে দুঃখবাদ কেন প্রবল। যেখানে বেশির ভাগ স্ত্রী-পুরুষ অভাব, ব্যাধি, অকালমৃত্যু, সামাজিক-আর্থিক অত্যা-চারের অসহায় বলি মাত্র সেখানে তাঁরা যে দুঃখবাদী এবং জীবনবিমুখ

হবেন এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আগাগোড়াই যে এদেশে দুঃখবাদী প্রতিন্যাস প্রবলতম ছিল এই প্রস্তাবের খণ্ডনেও নিতান্ত কম তথ্য মেলে না। সতের শতকে বের্ণিয়ের-এর ভ্রমণবিবরণ অথবা তারও হাজার বছর আগে হুয়েনৎসাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে তাঁদের সমকালীন ভারতের যেসব আদল মেলে তাতে দুঃখের চাইতে স্বাচ্ছন্দ্যের চেহারা কিছুটা বেশি প্রত্যক্ষ'[৫]। 'দশকুমারচরিতে' সাধারণ-মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক ছবি পাওয়া যায়; সেইসব ছবির মেজাজ না জীবনবিমুখ, না দুঃখবাদী। তাছাড়া যে-দেশে একসময়ে ভাবুক এবং কবিদের মধ্যে অনেকে ব্রহ্মকে রস এবং আনন্দ সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, যেখানে শৃঙ্গার বহুশতাব্দী ধরে আদিরস হিসেবে স্বীকৃত এবং সম্মানিত, যেখানে 'কামসূত্র'-জাতীয় গ্রন্থাদি বিদগ্ধ নাগরিকদের শিক্ষার জন্য শাস্ত্রাকারে রচিত, যেখানে দেবমন্দিরের গায়ে অজস্র মিথুনমূর্তি উৎকীর্ণ, সেখানকার সমাজ-সভ্যতাকে আগাগোড়াই, এমনকি মুখ্যত, দুঃখবাদী অথবা জীবনবিমুখ বলা আদৌ সংগত কি?

অপরপক্ষে কৃচ্ছ্রসাধনা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং তপস্যাদি যে এই উপমহাদেশে বহুকাল থেকেই একটি প্রবলধারা একথার স্বপক্ষেও প্রচুর প্রমাণ বর্তমান। সিন্ধু-সভ্যতার যোগী মূর্তিদের কথা বাদ দিলেও বৈদিক যুগেই যতী এবং মুনিদের উল্লেখ মেলে। উপনিষদে দুটি ধারাই সহগামী, কিন্তু বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক প্রভৃতিদের সাধনায় দুঃখবাদ সুপ্রতিষ্ঠ। ফলত কোনো কোনো উপনিষদের আনন্দবাদ এবং বুদ্ধের দুঃখবাদ স্পষ্টতই পরস্পর-বিরোধী। এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে বৈপরীত্যের আরো বহু সূত্র আছে—এখানে অন্তত একটি প্রধান সূত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। আত্মন্, ব্রহ্মন্ এবং উভয়ের সমন্বয় ঔপনিষদিক চিন্তার কেন্দ্রীয় প্রকল্প; কিন্তু বুদ্ধ ছিলেন অনাত্ত্ববাদী, আত্মন এবং ব্রহ্মনের মিলনের বদলে তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন নির্বাণের আদর্শ। আবার জৈনদের "জীব" পরিকল্পনা আত্মন এবং অনাত্ত পরিকল্পনা থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র। পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের মধ্যে নানা বিভেদ দেখা দেয়, এবং কয়েক শতাব্দী ধরে প্রসার লাভ করার পর এই উপমহাদেশ থেকে ঘোষিতভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রায় সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। এইসব বিভেদের তাত্ত্বিক এবং আচারগত সূত্রাদির খোঁজ মেলে বটে, কিন্তু কেন এবং কীভাবে এদেশে বৌদ্ধদের বিলোপ ঘটেছিল সে-প্রশ্নের তথ্যসমর্থিত সুউত্তর

এতাবৎ মেলে নি। অপরপক্ষে বুদ্ধের সময় থেকে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিলোপকাল পর্যন্ত বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদের ঘাত-প্রতিঘাতের বিস্তর সাক্ষ্য বিদ্যমান।

হিন্দুদের উপরে বৌদ্ধদের প্রভাব অথবা বৌদ্ধদের উপরে হিন্দুদের প্রভাব যতখানিই পড়ে থাক না কেন, দুঃখবাদ, সংসারবিমুখতা এবং সন্ন্যাসী অথবা ভিক্‌খুর আদর্শের জন্য কোনো পক্ষ অন্য পক্ষের কাছে ঋণী ছিলেন একথা ধোপে টেঁকে না। এই ধারাটি ভারতবর্ষে সম্ভবত ইতিহাসের সূচনা থেকেই ছিল, তবে কখনো তা বেশি কখনো তা কম প্রাধান্য পেয়েছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের হিসেবে জৈনদের আদি তীর্থঙ্কর ঋষভ ছিলেন নবম খৃষ্টপূর্ব শতকের মানুষ। তবে সংঘ-জাতীয় সংগঠনের পরিকল্পনা সম্ভবত বুদ্ধ থেকেই শুরু হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেটি লক্ষণীয় সেটি হল এই উপমহাদেশে বিপরীত ধারাটির সমাবস্থান এবং সক্রিয়তা। দেহের, বিশেষ করে পুরুষের মনে স্ত্রী-দেহের যে গভীর আবেদন, সৌন্দর্যবোধ এবং যৌনবৃত্তি যেখানে প্রায় অবিচ্ছেদ্য, তার আদি প্রকাশ কি আমরা মোহেন্‌জোদারোর নগ্ন-নতর্কীর মধ্যে দেখতে পাই না? পরবর্তীকালে জ্যামিতিক বৌদ্ধস্তূপের তোরণে যেসব অপরূপ যক্ষীমূর্তি আকার লাভ করেছিল তাদের উৎস নিশ্চয়ই উপনিষদ বা বৌদ্ধদর্শন ছিল না? অজন্তার গুহাগাত্রে যেসব ছন্দোময়ী সুন্দরীরা চিত্রিত তারা কি ভিক্‌খু জীবনের প্রতীক? ইলোরা, খাজুরাহো, কোনারক—গুহা থেকে মন্দির-গাত্রে, পশ্চিম থেকে পুবে সুরতসম্ভোগের যে অক্লান্ত বন্দনা বিচিত্র ভাস্কর্যে এবং উৎকীর্ণ রূপরেখায় উৎসৃষ্ট তাদের শিল্পী এবং ভোক্তারা সংসারবিমুখ অথবা দুঃখবাদী ছিলেন এ-প্রস্তাব কি বিশ্বাস্য? মৈথুনের সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আমরা জানি; এইসব মূর্তিদের মধ্যে অনেকগুলিই সম্ভবত তান্ত্রিকতার গূঢ়ার্থবাহী; কিন্তু অনেকগুলিই কি স্রেফ শৃঙ্গাররসের নন্দিত রূপায়ণ নয়? তাছাড়া যে তন্ত্রসাধনা বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত বৈষ্ণব সব ধর্মকেই গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল তাই-বা কেন এবং কীভাবে সমাজনিন্দিত এবং সুড়ঙ্গাশ্রয়ী হয়ে উঠল? এই উপমহাদেশে সাধুসন্ন্যাসীরা সংখ্যায় প্রচুর, তাঁদের মধ্যে দল উপদলও বিচিত্র, কিন্তু এদেশের অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ অতীতেও ছিলেন সংসারী, এখনো তাই। সেই সংসারীদের মধ্যে যাঁরা বিত্ত, শিক্ষা, জাতি এবং প্রতিপত্তির হিসেবে উপর কিংবা মধ্যতলের মানুষ

তাঁরা কেন এবং কবে থেকে নগ্নতাকে লজ্জাদায়ক এবং রতিসম্ভোগকে গোপনীয় ব্যাপার ভাবতে শিখলেন ? আঠারো শতকে বুন্দী রীতিতে আঁকা ছবিতে দেখা যায় প্রেমিক-প্রেমিকা নগ্নদেহে সঙ্গমরত, পাশে সঙ্গমরতা মায়ের হাতটি ধরে সুসজ্জিত বালকপুত্র দণ্ডায়মান। একি চিত্রকরের অদ্ভুত কল্পনামাত্র ? একি বিকৃতবুদ্ধি দর্শক এবং পৃষ্ঠপোষকদের ফরমাসে আঁকা ? সম্প্রতিকালেও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে দেখেছি স্থানীয় চিত্রকরকে কাঠের উপরে মৈথুনের ছবি আঁকতে—কিন্তু প্রকাশ্যে সেসব ছবির যাঁরা খরিদ্দার তাঁরা প্রধানত বিদেশী। আমার বন্ধু অগেহানন্দ ভারতীর অনুমান যে ইসলাম এবং খৃষ্টধর্মের প্রভাবে হিন্দুদের রুচিবদল ঘটে। তাহলে সে রুচিবদল কি "ভারতীয়" ? সেই রুচিবদল কি মুখ্যত উপরতলার শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ?

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই কৃষ্ণের কথা স্মরণে আসে। বেদে কয়েক জায়গায় কৃষ্ণ নামের উল্লেখ থাকলেও আর্যদের তিনি কোনো দেবতা ছিলেন না। কবে যে এই শ্যামবর্ণ অনার্য পুরুষ আর্যদের স্বল্পখ্যাত দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে অবতারবাদের সূত্রে যুক্ত হলেন, কবে যে আবার ভগবদ্‌গীতার কবি, দার্শনিক এবং সম্মোহসৃজনকারী চতুর সারথি উপযোজিত হলেন বংশীধারী গোপীবল্লভে, পণ্ডিতদের প্রচুর গবেষণা সত্ত্বেও এসব প্রশ্নের নির্ভরযোগ্য উত্তর এ-পর্যন্ত মেলে নি। কিন্তু কৃষ্ণকে অবলম্বন করে শুধু যে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ নয়, পরকীয়া প্রেমতত্ত্বও প্রসার লাভ করে একথা সর্বস্বীকৃত। এখন এই তত্ত্বের সঙ্গে সমাজস্বীকৃত গার্হস্থ্যধর্মের বৈপরীত্য নিতান্তই প্রকট, এবং ভক্তদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদি সত্ত্বেও হিন্দুসমাজে পরকীয়া প্রেমের সাধনা যে বেশ ঝুঁকির ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। অথচ ধর্মশাস্ত্রের নিয়মকানুন ভাঙার অনুপ্রেরণা যিনি যোগান তিনিই কোনো রহস্যাচ্ছন্ন পথে হয়ে দাঁড়ালেন হিন্দুদের অন্যতম প্রধান দেবতা। যে সুরতবন্দনার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি পরবর্তীকালে মুখ্যত কৃষ্ণকে অবলম্বন করেই তা বৈষ্ণব কবিতায় মুখরিত। উপমহাদেশের যে মানসরূপটি এখানে ধরা পড়ে তার সূত্র না মেলে 'মনুসংহিতা'য় না 'রামায়ণে' না সন্ন্যাসের আদর্শে। এই রূপটি বঙ্কিম পছন্দ করেন নি ; কৃষ্ণকে 'সর্বপাপসংস্পর্শ শূন্য, আদর্শ চরিত্র' হিসেবে উপস্থিত করতে গিয়ে তাঁকে বিস্তর বাক্‌ছল অবলম্বন করতে হয়েছিল। যিনি কেবল শুদ্ধ-

সত্ত্ব তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করে 'পারদারিক' হতে পারেন এ-প্রস্তাব তাঁর কাছে অসংগত ঠেকেছিল। 'বিষ্ণুপুরাণে' ব্যবহৃত রমণ ও রতির তিনি অর্থ করেছিলেন 'ক্রীড়া', 'হরিবংশে'র ক্ষেত্রেও 'রম্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন শব্দ সকলের ক্রীড়ার্থে অনুবাদ করেছেন ; কিন্তু 'ভাগবতপুরাণে' এসে তাঁকেও অনিচ্ছায় মানতে হয়েছিল স্তন, জঘন, নর্ম, নখাগ্রঘাত ইত্যাদির সঙ্গে কিছুটা 'ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ' আছে। তবে তাঁর মতে এই 'ইন্দ্রিয়সম্বন্ধের' কারণ 'গোপীগণ এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল'। তাছাড়া 'কৃষ্ণ স্বয়ং জিতেন্দ্রিয়'—পুরাণকারের প্রস্তাব অনুসারে 'আপনাতে ভিন্ন তাঁহার রতি-বিরতি আর কিছুতেই নাই'[১৬]।

ভারতবর্ষের নৈতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আরো নানা প্রশ্ন ওঠে। শুধু গান্ধী নন, আরো অনেকেই ঘোষণা করেছেন যে অহিংসা এবং শাকাহার ভারতীয়ত্বের প্রধান এবং বিশিষ্ট লক্ষণ। এই উপমহাদেশে শতকরা কতজন মাছ-মাংস খান তার কোনো নির্ভরযোগ্য আদমশুমার আমি দেখি নি, কিন্তু জৈন বৌদ্ধ এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণবদের বাদ দিলে এই উপমহাদেশের নেতা-উপনেতা থেকে সাধারণ মানুষরা যে অহিংসা নীতিতে খুব একটা আস্থাশীল এ-প্রস্তাবটি কি সত্যিই উপাত্ত-সমর্থিত? বেদের বিবরণ থেকে কি মনে হয় যে আর্যরা প্রেমের ভিত্তিতে দেশ জয় করেছিলেন? যে দুই মহাগ্রন্থের প্রভাব হিন্দুদের উপরে সব চাইতে ব্যাপক সেই 'মহাভারত' এবং 'রামায়ণে'র কেন্দ্রে কি দুই মহাহত্যাকাণ্ডের কাহিনী বর্ণিত হয় নি? 'গীতা'য় অর্জুনকে কৃষ্ণ যে কর্তব্যবোধে অনুপ্রেরিত করেছিলেন সে কি এক গালে কেউ চড় মারলে অন্য গালেও চড় মারার জন্য তাকে নিমন্ত্রণের আদর্শ? 'অর্থ-শাস্ত্রে' রাজ্যশাসনের যেসব রীতিপদ্ধতিগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি কি নিতান্ত অহিংস? শাক্ত এবং শৈবরা কি ভারতীয় ঐতিহ্যের অংশীদার নন? পাঠান-মোগল-ইংরেজ যুগের কথা বাদ দিলেও বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের রাষ্ট্রিক ইতিহাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের কি কিছু অপ্রাচুর্য ছিল? উপমহাদেশে স্বাধীনতা আসবার পরও কি আমরা কম দাঙ্গা, খুনোখুনি, যুদ্ধ দেখলাম? সৈন্য এবং সমরোপকরণের পিছনে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র যে ক্রমবর্ধমান অর্থ ব্যয় করে আসছে তা কি সাময়িক অপেরণ মাত্র? এসব কথা থেকে অবশ্যই বলা চলে না যে অন্যদেশের তুলনায় ভারত-বর্ষের মানুষ বেশি সহিংস, কিন্তু লড়াই, মারপিট, ধর্ষকাম এবং মর্ষ-কাম এদেশের ঐতিহ্যে নিতান্ত দুর্বল এ দাবিই কি ধোপে টেঁকে[১৭]।

হিন্দু নৈতিকতার আরেক সুবিখ্যাত স্তম্ভ হচ্ছে সতীত্ব। হিন্দু রমণীদের সামনে রামায়ণের সীতাকে আদর্শ হিসেবে অনেক শতাব্দী ধরে খাড়া করা হয়েছে, এবং যদিও সীতার দুঃখময় জীবনের কোনো নীতিসম্মত ব্যাখ্যা সহজসাধ্য নয়, তবু হয়তো এই নৈতিক শিক্ষার ফলেই হিন্দু সতীরা যেভাবে মুখবুজে দুঃখ সহ্য করে এসেছেন তার তুলনা বড়ো একটা মেলে না। কিন্তু জাতিভেদের মই বেয়ে একটু নিচের ধাপে নামলে, অথবা যাঁদের অস্পৃশ্য বলা হ'ত এবং যাঁরা বিভিন্ন আদিমগোষ্ঠীর অন্তর্গত তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে একটু জানা যায় যে সর্বকামী পাতিব্রত্য বহুক্ষেত্রেই তাঁদের নৈতিকতার অবশ্যক অঙ্গ নয়। মালাবার অঞ্চলের শুধু থিয়া, মোপ্‌লা ইত্যাদিদের মধ্যেই নয়, জাতিভেদের উপর তলার অধিবাসী নায়ারদের মধ্যেও মায়ের দিকের সম্পর্কই প্রধান, এবং সেখানে কোনো স্ত্রী তাঁর স্বামীকে ত্যাগ করলে সমাজের দ্বারা ধিক্কৃত হন না। বিধবাবিবাহ সমর্থনের জন্য বিদ্যাসাগর বহু ধর্মশাস্ত্র ঘেঁটে 'পরাশর সংহিতা'র উক্তি উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু উপরতলা থেকে নিচের তলায় নজর ফেরালে বোঝা কঠিন হ'ত না যে এ ব্যাপারে নিষেধাদি প্রধানত উপর তলাতেই নিবদ্ধ। আবার যে পঞ্চকন্যার নাম প্রত্যহ স্মরণ করলে নাকি মহা-পাতক নাশ হয় সেই অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা এবং মন্দোদরী কোন্ কোন্ অঞ্চলের এবং কোন্ কোন্ সামাজিক-ঐতিহাসিক স্তরের প্রতিভূ? তাঁরা তো কেউই ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে সতী ছিলেন না। 'চিন্তাবিষ্ট সীতা' নামে দীর্ঘ কবিতায় বিখ্যাত কবি কুমারণ আসান (১৮৭৩-১৯২৪) রাম সম্পর্কে সীতার যেসব ভাবনাকে রূপ দিয়েছিলেন তাদের সূত্র বাল্মীকি কিংবা তুলসীদাসে মেলে না; সীতার এই রাম দুর্বলচিত্ত, স্ববিরোধী, পরমতনির্ভর, সুবিধাবাদী, স্ত্রীর প্রতি অন্যায়কারী এবং অনুকম্পাহীন[১৮]। আসান জাতিতে এঝাভা; ধর্মসংস্কারক শ্রীনারায়ণ গুরু-র (১৮৫৪-১৯২৮) শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন; তাঁর ভাষা মালয়ালম্। তামিল লেখক পুড়ুমাইপিট্টি তাঁর বিখ্যাত গল্প 'শাপবিমোচনে' সীতার সঙ্গে অহল্যার সাক্ষাৎকারের কাহিনী লিখেছেন। সীতার মুখে তাঁর প্রতি রামের আচরণের বিবরণ শুনতে শুনতে—'তিনি সত্যিই নিজে সকলের সামনে তোমাকে আগুনে পুড়ে পরীক্ষা দিতে বললেন!'—অহল্যা বুঝতে পারলেন গৌতম অথবা ইন্দ্রের তুলনায় রাম মোটেই বেশি

উদার অথবা বিবেকবান ব্যক্তি নন, এবং রাম সম্পর্কে তাঁর অধ্যাস দূর হওয়া মাত্র সেই বেদনার আঘাতে তিনি আবার পাথর হয়ে গেলেন। আসান এবং পুড়ুমাইপিট্টট এই শতকের লেখক, কিন্তু রাম-সীতা সম্পর্কে তাঁদের এই ভাবনা দ্রবিড় দেশের ব্রাহ্মণবিরোধী লোক-সংস্কৃতি থেকে পাওয়া। সীতার প্রশ্নহীন পাতিব্রত্য অথবা সতীত্বের আদর্শ কি তাহলে হিন্দুসমাজের উপরতলার গোষ্ঠীপতিদের স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজনজাত কল্পনামাত্র?

অস্তিত্ববিচারের পথে গেলে পদে পদে এই ধরনের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এই উপমহাদেশের বিরাট মুসলমানসমাজ নিয়েও প্রশ্ন কম নয়—তাঁদের মধ্যেও বৈচিত্র্য এবং বিরোধ প্রচুর—তাঁদের মধ্যেও বিভিন্ন রকমের জাতিভেদ, স্তরবিভাগ, শ্রেণীদ্বন্দ্ব বর্ত-মান[১৯]। তাঁদের নিয়ে আলাদা আলোচনা দরকার। আপাতত এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে ভাবরূপ এবং অস্তিত্ববিচার দুদিক থেকেই হিন্দুদের সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশি তথ্যাদি পাওয়া যায়, এবং আমি নিজে যদিও আকৈশোর নাস্তিক তবু প্রধানত উক্ত কারণে জিজ্ঞাসার প্রথম খেপে প্রধানত হিন্দুদের নিয়েই প্রশ্ন তুলেছি।

চার

এখন এইসব প্রশ্ন থেকে আমি মোটেই এই সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হই নি যে বৈচিত্র্য এবং বিরোধ আছে বলেই ঐক্যের অস্তিত্ব অসম্ভব, অথবা অবচ্ছেদ থাকার ফলে পরম্পরা অপ্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করা এবং ঘোরার অভিজ্ঞতা ছাড়াও সম্প্রতিকালে ভারতচর্চার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকদের তথ্য এবং তত্ত্বসংক্রান্ত বিবিধ গবেষণার সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় আছে। অন্তত এটুকু আমি জানি যে এইসব জ্ঞানীব্যক্তিরা বিভিন্ন পথে এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই উপমহাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে ব্যাপৃত। তুলনামূলক সমাজ-তাত্ত্বিকদের ভিতরে কেউ কেউ প্রয়াস পেয়েছেন ভারতীয় সমাজকে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট আদিরূপের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে বিশ্লেষণ করতে। উনিশ শতকে মার্ক্‌স্-প্রস্তাবিত "এসিয়াটিক মোড"-এর কথা এই সূত্রে স্মরণে আসে। আবার বেইলি প্রমুখ সমকালীন সমাজবিজ্ঞানীরা ভারতবর্ষের অনন্যতা অস্বীকার করে এখানে বিভিন্ন

আদিরূপের তুলনাসাধ্য উপস্থিতি অনুসন্ধান করছেন[২০]। কারো কারো প্রযত্ন হচ্ছে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রধান বৈশিষ্ট্যের এমন একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকানির্মাণ যাতে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিচার করা সম্ভব, এবং যাদের আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে পরিসংখ্যানের হিসেবে মাপা চলে। সম্প্রতিকালে যে প্রকল্পটি ভারতচর্চার ক্ষেত্রে সম্ভবত সব চাইতে বেশি প্রভাব ফেলেছে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ে প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক রবার্ট রেডফীল্ড্-এর সূত্রে সেটির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। আদিম সমাজ এবং সভ্যসমাজের মধ্যে পার্থক্য বিচারের প্রসঙ্গে রেড্ফীল্ড্ প্রস্তাব করেন যে সভ্য সমাজে একদিকে থাকে একটি 'বৃহৎ ঐতিহ্য' এবং অন্যদিকে অনেকগুলি 'ক্ষুদ্র ঐতিহ্য'। বৃহৎ ঐতিহ্যের উপস্থিতি 'সভ্যতা'র বৈশিষ্ট্য, এবং রাজধানী, নগর, পীঠস্থান, বিদ্যালয়, আশ্রম, বিদ্বান, পুরোহিত, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষিতজন, সাহিত্য, শাস্ত্র, অনুষ্ঠানাদিকে অবলম্বন করে এই বৃহৎ ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। সম্প্রসারণের সূত্রে বৃহৎ ঐতিহ্য একদিকে ক্ষুদ্র ঐতিহ্যদের উপরে প্রভাব ফেলে, তাদেরকে নিজের অন্তর্গত অথবা নিজের মধ্যে উপযোজিত করে ; অন্যদিকে ক্ষুদ্র ঐতিহ্যেরা যেমন বৃহৎ ঐতিহ্য থেকে অনেক কিছু নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে তেমনি তারা বৃহৎ ঐতিহ্যের মধ্যেও নিজেদের অনেক কিছু অনুপ্রবিষ্ট করায়[২১]। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে অনেক ঐতিহাসিক এবং নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী ভারতবর্ষে একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে একের ব্যাখ্যা খুঁজেছেন এবং খুঁজছেন।

রেডফীল্ড্-এর প্রকল্প এবং তারি ভিত্তিতে অনুসন্ধানের মূল্য আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই উপমহাদেশের কোন্ কোন্ দিকগুলি এই প্রকল্পিত বৃহৎ ঐতিহ্যের মুখ্য উপাদান? ভারতীয় সভ্যতা যুগপৎ পরম্পরা এবং পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত এই কথার উপরে ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানী বর্নার্ড কোন্ বারবার জোর দিয়েছেন। কিন্তু তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে ভারতীয় ঐতিহ্যের উপাদান বিশ্লেষণ করতে গেলে কোন্ দিকটি যে বৃহৎ ঐতিহ্যের-র অন্তর্গত আর কোন্‌টি যে ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের থেকে আহৃত তার নিরূপণ নিরতিশয় দুঃসাধ্য[২২]। যেমন স্টাল দেখিয়েছেন যে ভূতাবেশের কল্পনা বৈদিক সাহিত্যেও উপস্থিত ; সেটি অনার্যদের অথবা উপজাতিদের কাছ থেকে এসেছে এ-প্রস্তাব অসংগত। তাছাড়া ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের কথা যদি বাদও

দেওয়া যায় ভারত উপমহাদেশে বৃহৎ ঐতিহ্য কি একটি? সিন্ধু-সভ্যতার ঐতিহ্য (যার প্রবক্তা, পুরোহিত এবং রক্ষক হয়তো ছিলেন সেই ব্যক্তিরা যাঁদের শ্মশ্রুল, যোগারূঢ় এবং উত্তরীপরিহিত বেশ কয়েকটি মূর্তি মোহেন্‌জোদারোতে পাওয়া গেছে), বৈদিক, দ্রবিড়, বৌদ্ধ, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক ঐতিহ্য, মুসলমান যুগের ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠা যে ঐতিহ্য—এদের প্রত্যেকটিকেই কি এক একটি বৃহৎ ঐতিহ্য হিসেবে গণ্য করা সংগত নয়? একদিকে পরম্পরা এবং পরিবর্তন আর অন্যদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের উপযোজন-অভিযোজন সত্ত্বেও এইসব বৃহৎ ঐতিহ্য কি তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একটিমাত্র সমসত্ত্ব ঐতিহ্যে একীভূত হয়েছে? সম্প্রতিকালেও কি তাদের সেই স্বাতন্ত্র্যের সক্রিয় উপস্থিতি চোখে পড়ে না?

এইসব প্রশ্ন সম্ভবত অবান্তর নয়; অন্তত এদের প্রমাণ-সমর্থিত উত্তর আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। এবং যে সব প্রকল্প যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা অসমর্থিত তাদের প্রমাণিত বলে ধরে নিয়ে মন্ত্রের মতো বারবার উচ্চারণ করলে তারা সত্য হয়ে উঠবে এমন ভরসা আমার নেই। আমার ধারণা, জিজ্ঞাসা এবং অধ্যবসায়ী অনুসন্ধানের সূত্রে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান গড়ে ওঠে। বস্তুত গত পঁচিশ-তিরিশ বছরে এই উপমহাদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসুদের গবেষণা ক্রমেই স্পষ্টতরভাবে অস্তিত্ববিচারমুখী হয়ে উঠেছে, এবং এটিকে আমি বিশেষ শুভ লক্ষণ মনে করি[২৩]। বিভিন্ন গ্রাম এবং গ্রামপুঞ্জ, বিভিন্ন শহর এবং শহরের অংশবিশেষ, বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতি, সম্প্রদায়, দল ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহ এবং বিচার-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে এই উপমহাদেশের একটি মানবীয় মানচিত্র ক্রমে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। এখানকার জটিল এবং বিচিত্র জাতিবিন্যাসকে বোঝবার জন্য ধর্মশাস্ত্র, পুরাণাদি, কুলজী-গ্রন্থমালা প্রভৃতির বিশ্লেষণ অবশ্য প্রয়োজন। অপরপক্ষে বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি নির্বাচিত জাতি অথবা জাতিপুঞ্জের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদির বিজ্ঞানসম্মত আরোহীবিচার যে সম্প্রতিকালে এক্ষেত্রে প্রশ্নের এবং জ্ঞানের কত নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে 'কনট্রিবিউশন টু ইণ্ডিয়ান সোসিওলজি' পত্রিকাটি থেকে তার খোঁজ পাওয়া যায়। এইসব সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে একদিকে যেমন অধ্যাপক শ্রীনিবাস-বর্ণিত 'সংস্কৃতায়নে'-এর পরিচয় মেলে,

অন্যদিকে তেমনি শহরে এবং গ্রামে নানাবিধ সংঘাতের সূত্রগুলিও পরিলক্ষিত হয়[২৪]।

জিজ্ঞাসার প্রথম এবং মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ভরযোগ্য জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানান্বেষণের সঙ্গে যুক্ত অথচ বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা থেকে পৃথক অপর দুটি প্রসঙ্গেরও এই সূত্রে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে একদিকে যেমন আঞ্চলিক, শ্রেণীগত, দলীয় এবং অন্যান্য সংঘাত প্রখরতর হয়েছে অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রিক, আর্থিক, এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন প্রক্রিয়াও প্রাবল্য লাভ করেছে। এই কেন্দ্রাভিগতা জওহরলালের আমলে যথেষ্ট প্রাধান্য পায়; ইন্দিরা গান্ধী এটিকে তাঁর শাসন ব্যবস্থার মূল সূত্র করে তোলেন। ক্ষমতার অতিশয় কেন্দ্রায়ন যে সাধারণ মানুষের জীবন কতটা দুর্বিষহ করে তুলতে পারে ভারতীয় নাগরিকেরা ইতিমধ্যে তার কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন; কিন্তু কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সাধারণভাবে যেসব বিপদ জড়িত তাদের নিয়ে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে, খুব বেশি আলোচনা হয় নি। একটি বিপদের কথা বলি। ক্ষমতা যাঁদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় সচরাচর দেশ সম্পর্কে তাঁদের মনে একটি পরিকল্পনা থাকে এবং দেশবাসীকে তাঁরা সেই পরিকল্পনার ছাঁচে ঢেলে গড়বার উদ্দেশ্যে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। যাঁরা সেই পরিকল্পনায় এবং উদ্যোগে সায় দিতে গররাজী তাঁদের তখন বলা হয় "দেশদ্রোহী" এবং তাঁদের প্রকাশ্য সমালোচনার সমস্ত সম্ভাবনাকে উচ্ছেদ করবার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা চলে। আমাদের যুগে বিভিন্ন সার্বিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই ভয়ংকর ঘটনা বারবার ঘটেছে এবং ঘটছে। শুধু ফাসিস্ত ইতালী, নাট্‌সী জর্মানী বা বলশেভিক রাশিয়াতেই নয়, তথাকথিত গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও 'আন্‌অ্যামেরিকান অ্যাকটিভিটিজ'-এর অজুহাতে ম্যাকার্থির দাপটের স্মৃতি এখনো একেবারে ফিকে হয়ে যায় নি। শ্রীমতী গান্ধীও 'জাতীয় সংকটের' দোহাই দিয়ে এই ধরনের চেষ্টা পূর্বে করেছিলেন; দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসবার পর আবার তিনি সব রকমের শক্তি নিজের হাতে সমাহৃত করবার উদ্যোগ করছেন। জাতীয় নিরাপত্তা এবং ঐক্যের নামে জুলুমতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে নতুন ব্যাপার নয়। স্বাধীন এবং নিরন্তর জিজ্ঞাসা এই বিপদের অন্যতম নিবারক, এবং আমি যে প্রশ্নগুলি তুলেছি তাদের পিছনে এই প্রায়োগিক বিবেচনা অন্তত

আংশিকভাবে সক্রিয়।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি মুখ্যত প্রায়োগিক। আমরা চাই বা না চাই প্রত্যেক সমাজেই যাঁরা জাতি বা শ্রেণী বা গুণ বা শিক্ষা বা সংগঠন অথবা অন্যবিধ নানা কারণের সমাবেশে বিশেষ প্রতিপত্তি ভোগ করেন, যাঁদের বলা হয় 'এলিট', তাঁদের ভাবনাচিন্তা আদর্শ উদ্যম সেই সেই সমাজের গতি নিরূপণে বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে। রেডফীল্ড্ বর্ণিত 'বৃহৎ ঐতিহ্যে' এঁদের ক্রিয়া এবং প্রতিপত্তি স্পষ্ট। ভারত উপমহাদেশে একদা সংস্কৃত ভাষাভাষী, পরে ফারসী ভাষাভাষী, এবং শেষে ইংরেজী ভাষাভাষীদের প্রভাবের কথা আমরা জানি। এই 'এলিট'-রা ভবিষ্যতের যেসব রূপ কল্পনা করেন অতীত এবং বর্তমান সম্পর্কে তাঁদের ধারণাদির সঙ্গে সেইসব রূপের স্বভাবতই গভীর যোগ থাকে। ভবিষ্যৎ-রচনার প্রয়োজনে অতীত এবং বর্তমানের বিচার-বিশ্লেষণ যেমন অপরিহার্য, তেমনি ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদানের ভিতর থেকে বাছাইয়ের দায়িত্বও এড়ানো চলে না। কিন্তু বাছাইয়ের প্রয়োজনে ঐতিহ্যের অপব্যাখ্যা একেবারেই অসংগত। নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের অন্যতম প্রধান শর্ত হল উপাত্ত এবং আরোহের ক্ষেত্রে অবিচল সত্যনিষ্ঠা। অপরপক্ষে যাঁর মনে আদর্শরূপ স্পষ্ট তিনি অতীত এবং বর্তমানের অস্তিত্ববিচারের ভিত্তিতে নির্ণয় করবার চেষ্টা করবেন এইসব উপাদানের মধ্যে কোন্‌গুলি তাঁর কাছে গ্রহণীয়। যেহেতু আদর্শের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে সে-কারণে বাছাইয়ের মধ্যেও অবশ্য প্রভেদ থাকবে। কিন্তু আদর্শকল্পনা এবং অস্তিত্ববিচারের ভিতরে যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান সেটি নিয়ত স্মরণে রাখলে অন্তত অধ্যাসনজাত বিবিধ ভ্রান্তি আমরা এড়াতে পারব।

ব্যক্তিগতভাবে আমার আদর্শ সমবায়ভিত্তিক বিকেন্দ্রিত সমাজ। এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিভেদ-বৈপরীত্য থাকলেও এই বিশেষ আদর্শের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তার ভিতরে আমি একটি গভীর মিল দেখতে পাই[২৫]। কিন্তু যখন পড়ি কিংবা শুনি যে ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল উৎস উপনিষদ, অথবা রামায়ণ-বর্ণিত রামরাজ্যে হরিজনদের উপরে অত্যাচার হ'ত না, কিংবা ভারতবর্ষের প্রাচীন পঞ্চায়েতী প্রথা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক, অথবা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ব্যাপক সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনা নিহিত ছিল, তখন আমার মনে প্রশ্ন ওঠে এইসব দাবি যাঁরা করছেন অস্তিত্ব-

বিচারের ক্ষেত্রে তাঁরা কতখানি নিষ্ঠাবান। ভাবালুতা, শ্লোগান, অতিশয়োক্তি—এসব দিয়ে আমরা আর কতকাল নিজেদের এবং অন্যদের ভোলাব? বাস্তবনিষ্ঠ জ্ঞানের চর্চা ছাড়া হিতকর পরিবর্তনের পথ কীভাবে মিলবে?

এখানে আমার সমস্ত প্রশ্নই একটি সূত্রে গ্রথিত। সেটি হল, এই উপমহাদেশের স্থানকালপাত্রে সংসৃষ্ট কোনো নির্ভরযোগ্য মানবীয় মানচিত্র অদ্যাপি পাওয়া যায় কি না, পাওয়া গেলে কী তার রূপ, না পাওয়া গেলে কীভাবে তা নির্মাণ করা যায়? হয়তো এইসব প্রশ্ন শুধুমাত্র আমারি অজ্ঞতার পরিচায়ক। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের অনুকরণ করে কোনো আধুনিক ঋষি যদি হুংকার ছেড়ে আমাকে বলেন (বৃহদারণ্যক ৩, ৬, ১), "ওহে শিবনারায়ণ রায়, আর বেশি প্রশ্ন কোরো না, শেষে তোমার মাথাটি যে খসে পড়বে," তাহলে তার দ্বারা তাঁর দাপট নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে, কিন্তু আমার (এবং আরো অনেকের) জিজ্ঞাসার নিরাকরণ হবে কি?

পাঁচ

এখন ভারতবর্ষের ঐক্য রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকেরই কাম্য ছিল। কিন্তু উগ্র স্বাজাতিকতার বিপদ সম্পর্কেও এঁরা মোটেই অনবহিত ছিলেন না। বঙ্কিম জানতেন ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌ ভারতীয় ঐতিহ্যপ্রসূত আদর্শ নয়; এটি পশ্চিম থেকে আমদানি করা ভাবনা এবং এদেশের ইংরেজীশিক্ষিতদের কাছ থেকেই এটি সমর্থন পেতে পারে। স্বাজাতিকতার দুটি অবিভাজ্য দিকের প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। একদিকে দেশের সামূহিক সত্তার ভিতরে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তার বিলোপ, অন্যদিকে বিদেশী কোনো সামূহিক শক্তিকে শত্রু বিবেচনায় তার প্রতি প্রবল বৈরিতা—দুটির অবিচ্ছেদ্য সন্নিবেশ না ঘটলে স্বাজাতিকতা ইতিহাসে কার্যকরী প্রভাব হয়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং সর্বমানবীয় ঐক্য বঙ্কিমের কাম্য হলেও তিনি তাঁর অনেক রচনাতে স্বাজাতিকতাকেই ধর্মরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁর দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের চাইতে তাঁর আবেগগর্ভ দেশমাতৃকার কল্পনা এদেশের শিক্ষিত হিন্দুদের উপরে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে[২৬]।

ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌ বা স্বজাতিবাদকে রবীন্দ্রনাথ খুবই স্পষ্ট এবং

কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। তাঁর বিচারে এই প্রতিন্যাসের উৎস ভয়, সন্দেহ ও লোভ ; এর উদ্দেশ্য রাষ্ট্রিক ক্ষমতা অর্জন ও তার প্রসার ; সামূহিক স্বার্থপরতা এর চরিত্র। বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্যের সাধনা ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ তার বিরোধী। স্বাধীন, সৃষ্টিশীল সহযোগের বিনাশ ঘটিয়ে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র মানুষকে আমলাচালিত যন্ত্রে পর্যবসিত করতে চায়। পিণ্ডিত হওয়া, একরূপ হওয়া, উর্দির নিচে আপনাকে মুছে দেওয়া, এর নাম ঐক্য নয়। বহুর মধ্যে সংগতি প্রতিষ্ঠাই মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রকৃত পথ[২৭]। কিন্তু স্বজাতিবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী অন্তত বাঙালি শিক্ষিত মনে বিশেষ প্রভাব ফেলে নি ; বরং জীবদ্দশায় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা এদেশে ব্যাপক বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল ; এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ভারতীয়ত্বের কল্পনাকে মুখ্যতঃ হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিলেন।

ঐক্য অবশ্যই আমাদের কাম্য, কিন্তু মনে হয় এই বাস্তব-সত্যকেও স্বীকার করে নেওয়া দরকার যে এই উপমহাদেশে ঐক্যের চাইতে বৈচিত্র্যই বেশি প্রকট। এই বৈচিত্র্যকে বিপত্তি হিসেবে নয়, সম্পদ এবং বিকাশের সূত্র হিসেবে গণ্য করেই যথার্থ ঐক্যের দিকে এগোনো সম্ভবপর। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে ও শত্রুরাষ্ট্রের কথা বলে যে আনুগত্য অর্জিত হয় তা বন্ধ্যা, স্বল্পস্থায়ী, বিবেকনিরোধী। দেশবিভাগ এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিস্তর বিচার-বিবেচনা করে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এইসব বাস্তবসত্য সম্পর্কে কমবেশী সচেতন ছিলেন। ভারতীয় সংবিধানে সংগত কারণেই প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছিল নাগরিকের মৌল অধিকারাবলীর উপরে। গণতন্ত্র, আমেল রাষ্ট্রব্যবস্থা, তফসিলী জাতিগোষ্ঠীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, বিভিন্ন প্রধান ভাষাগুলিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি, প্রশাসনিক ক্ষমতার নানাভাবে নিয়মন—এ-সবই সংবিধান রচয়িতাদের কাণ্ডজ্ঞান ও নীতিবোধের পরিচায়ক।

কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর গত কয়েক দশক ধরে এদেশ যে-পথে চলেছে তাতে বৈচিত্র্যসমন্বিত ঐক্যের সাধনা মোটেই দৃঢ়তর হয় নি। বরং একদিকে যেমন ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন প্রচেষ্টা আরও উগ্র রূপ নিয়েছে অন্যদিকে তেমনি বৈচিত্র্যকে স্বাগত না করে তাকে ক্রমাগতই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সহিংস বিরোধের দিকে। সারা দেশবাসীর বিকাশ এবং

বিকাশের সামর্থ্য বৃদ্ধি না পেয়ে যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা হল মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় রাজধানীর বিকাশ। বৈদেশিক শত্রুর বিভীষিকা দেখিয়ে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বেড়ে চলেছে; পরিকল্পিত উন্নয়নের নামে সমস্ত অঞ্চলকে কেন্দ্রের দাক্ষিণ্যের উপরে আরো নির্ভরশীল করা হচ্ছে; গ্রাম এবং নগরের মধ্যে অবস্থাগত ব্যবধান আরও দুরতিক্রম্য হয়ে উঠছে। হিন্দীভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে উত্তর-দক্ষিণের বিরোধ প্রবলতর হচ্ছে; প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলির কেন্দ্রবিমুখতা তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। জাতীয় ঐক্যের নামে আমলা-পুলিশের ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে; কথায় কথায় অধ্যাদেশ এবং রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হচ্ছে। স্বাধীনতা নয়, শুভবুদ্ধি এবং সৃজনশীলতার অনুশীলন নয়, দারিদ্র্য এবং অসাম্যের উচ্ছেদ নয়, বিভিন্ন অঞ্চলের ভিতরে সৌহার্দ্য ও সহযোগের প্রতিষ্ঠা নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মিত্রতা নয়, পরবর্তী প্রজন্মের সামনে প্রেরণাসঞ্চারী অভিনব উদ্যোগের আদর্শ স্থাপনা নয়—আমরা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছি সন্ত্রাসের দিকে, রাজনীতির পায়ে সমাজ-সংস্কৃতির বলি-দানের দিকে, গৃহযুদ্ধ এবং একনায়কত্বের দিকে।

এই আত্মঘাতী প্রবণতা থেকে উদ্ধারের কি কোনো সম্ভাবনা ও উপায় নেই? আমার ধারণা আছে, কিন্তু ক্ষমতাই যাঁদের মূল লক্ষ সেই রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের নেতারা যে এদিকে আকৃষ্ট হবেন তার আশা কম। এই উপায় নিয়ে ভাবতে হবে তাঁদেরই যাঁরা জন-কল্যাণ চান, যাঁরা সুশৃঙ্খলভাবে ভাবতে পারেন এবং সেই ভাবনাকে দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করতে পারেন, যাঁরা রাজনীতির চাইতে অনেক বেশি মূল্য দেন সমাজ-সংস্কৃতিকে, যাঁরা পিণ্ডিত একান্বয় চান না, চান বৈচিত্র্যের ভিতরে সেই ধরনের সমন্বয় যার অন্যতম সার্থক প্রতীক সিম্ফনি।

এই উপায় প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তিনটি প্রাথমিক প্রস্তাব বিবেচনার জন্য রাখতে চাই।

প্রথমত, আমাদের সব চাইতে দরকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। পরস্পরের শ্রেষ্ঠকীর্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটলে শ্রদ্ধান্বিত সম্পর্ক সম্ভবপর হয়, সম্ভব হয় ঈর্ষামুক্ত সহযোগ। অনুবাদ, অনুবাদ এবং অনুবাদ—এই অবশ্যকরণীয় কাজটিকে আমরা এতাবৎ নিতান্ত নির্বোধের মতো অবহেলা করেছি। প্রত্যেক অঞ্চলেই শিক্ষিতদের মধ্যে যথেষ্টসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষ চাই যাঁরা আপন-আপন

মাতৃভাষা ছাড়াও অন্তত আরেকটি ভারতীয় ভাষা বিশেষ যত্ন ও অনুরাগের সঙ্গে চর্চা করেছেন এবং সেই ভাষা থেকে তার শ্রেষ্ঠ রচনাবলী আপনার মাতৃভাষায় নিষ্ঠার সঙ্গে অনুবাদ করার কাজে নিজের জীবন নিয়োজিত করবেন। পশ্চিমে বিবেকী এবং সার্থক তর্জমাকার অসংখ্য। আমাদের ক্ষেত্রে যেটুকু অনুবাদ হয়েছে (মুখ্যত ইংরেজীর সূত্রে জনপ্রিয় পশ্চিমী সাহিত্য থেকে) তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অক্ষম এবং অযত্নসাধিত। আধুনিক জীবন্ত একটি ভারতীয় ভাষা থেকে আরেকটি ভাষায় মূলানুগ, সৎ অনুবাদ এখনো দুর্লভ। এই কাজ ব্যাপকভাবে করা দরকার—অনুবাদ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ-ইতিহাস বিষয়ে নির্ভরযোগ্য, সুলিখিত প্রবন্ধগ্রন্থ। এটি দু'একজনের সাধ্য নয়; এতে বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য-পরিষদ, বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র, প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, সকলেরই মূল্যবান ভূমিকা আছে।

দ্বিতীয়ত, ক্ষমতার ক্রমিক বিকেন্দ্রায়নের জন্য দেশব্যাপী উদ্যোগ দরকার। এটি সহজ নয়, কারণ ক্ষমতা এদেশে ইতিমধ্যেই অনেকখানি কেন্দ্রীভূত এবং রাষ্ট্রিক আর্থিক প্রধান ধারাটি কেন্দ্রাভিগ। কিন্তু এদেশের মৌল ভাবুকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রধান পুরুষ—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, মানবেন্দ্রনাথ, জয়প্রকাশ এই ধারার স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁদের যুক্তি ও আদর্শ থেকে গ্রহণীয় উপাদান নিতান্ত কম নয়। এদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী ও কৃষিনির্ভর। শিক্ষার প্রসার ও সমবায়ী উদ্যমের সূত্রে যদি গ্রামগুলিকে সক্রিয় ও স্বনির্ভর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে বিকশিত করা যায় তাহলে বিকেন্দ্রায়নের আদি এবং সবচাইতে নির্ভরযোগ্য শক্তি হয়তো সমকালীন ধারাকে ভিন্ন দিকে চালিত করতে পারে। তারপর সংগঠনশীল আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে যাতে ক্রমশ বর্তমান ব্যবস্থায় যেগুলি উচ্চতর ক্ষমতাকেন্দ্র সেগুলি থেকে বিভিন্ন কার্যকরী ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিম্নতর ক্ষমতাকেন্দ্রগুলিতে হস্তান্তরিত হয় এবং নিম্নতর কেন্দ্রগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীদের সচেতন অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা দলীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাবে অন্যদিকে তেমনি ভারত একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠবে। হয়তো এই যুক্তরাষ্ট্রের বনিয়াদ মজবুত হবার পর এই উপমহাদেশেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহযোগে একটি দক্ষিণ-এশীয় কমন মার্কেট, পার্লামেণ্ট এবং

সমামেল ব্যবস্থা বা মিত্রসংঘ আকার পাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং তার ফলে প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয়ের একটা বড় অংশ কৃষি ও কুটির-শিল্পের বিবর্ধনে ব্যয়িত হতে পারবে।

বিকেন্দ্রায়নের একটি বিপদ বিচ্ছিন্নতা, অন্যটি বিভিন্ন অঞ্চলের অসমবিকাশ। জবরদস্তি করে এর কোনোটির সমাধান সম্ভব নয়। সৈন্য-পুলিশ প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাতন্ত্র্যকামী আঞ্চলিক আন্দোলনকে সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু তার বিক্ষোভের কারণ দূর করতে পারে না। আগে বৃহৎ ঐতিহ্য এবং ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের কথা বলেছি। আজকের ভারতবর্ষে যেমন বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জ্ঞান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে যথার্থ পরিচয় ঘটা দরকার, দরকার ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রায়ন, তেমনি দরকার আঞ্চলিক বিভিন্ন ঐতিহ্যের পাশাপাশি একটি সর্বভারতীয় আধুনিক বৃহৎ ঐতিহ্য গড়ে তোলার। কর্মফল ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস, জাতিভেদ-ব্যবস্থা ইত্যাদি যেগুলিকে এদেশের, বিশেষ করে হিন্দুদের সাধারণ লক্ষণ বলা হয় সেগুলির ভিত্তিতে অবশ্যই এই আধুনিক বৃহৎ ঐতিহ্য গড়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সাম্য, বৈজ্ঞানিক প্রতিন্যাস, প্রাজাতিক কল্যাণচেতনা—এইসব এবং এই জাতীয় আদর্শই এই নির্মীয়মাণ বৃহৎ ঐতিহ্যের মুখ্য উপাদান। পূর্বেও বৃহৎ ঐতিহ্যের রচনায় এবং বিকাশে দেশের মনীষীরাই মুখ্য অংশ নিয়েছিলেন। আজও সে দায়িত্ব তাঁদের উপরেই বর্তেছে। তাঁরা যদি সে-দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হন তবেই হয়তো যে সম্ভাবনার কথা বলেছি তা বাস্তব হতে পারে।

আমি ঐক্য চাই, কিন্তু বৈচিত্র্যের বিলোপ ঘটিয়ে নয়। ঐক্যের পথ আমাদের খুঁজতে হবে। আমরা একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক, সে কারণে আমরা একটি জাতি এবং আমাদের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত—এই স্তোভের সাহায্যে আমরা আমাদের পথের নির্দেশ পাব না। বৈজ্ঞানিক, সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্র-নীতিবিদ, সমাজসেবী, শিল্পী-সাহিত্যিক সকলকেই এই পথের আবিষ্কারে এবং নির্মাণে অংশভাক্ হতে হবে। মহৎ কাজে ফাঁকি চলে না।

বাংলার রেনেসাঁস

> These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of......
>
> মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসুকে পত্র, ১৮৬০

> The greatest gift of the English ··· is the Renaissance which marked our 19th century. Modern India owes everything to it.
>
> যদুনাথ সরকার, ১৯২৮

কোন ব্যক্তিকে যখন আমরা শিল্পী বলি অথবা কোন আচরণকে যখন আমরা সৎ বলি অথবা কোন সমাজ অথবা দেশকে যখন আমরা স্বাধীন বলি তখন শিল্প, সততা, কিংবা স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের মনে মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট ধারণা কাজ করে। এই ধারণা বিষয়ে যাঁদের ভিতরে মতৈক্য বিদ্যমান তাঁরা তখন বিচার করতে পারেন উক্ত ব্যক্তি, আচরণ অথবা সমাজের বৈশিষ্ট্যবর্ণন প্রসঙ্গে উদ্দিষ্টের উপরে শিল্পী, সৎ বা স্বাধীন শব্দটির আরোপ সংগত কিনা।

ইংরেজশাসিত বাংলায় রেনেসাঁস ঘটেছিল কি ঘটে নি এ প্রশ্নের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু রেনেসাঁস বলতে কি বোঝায় সে-সম্পর্কে ধারণায় যদি মোটামুটি মিল থাকে তাহাকে অর্বাচীন বাংলার ইতিহাস ব্যাখ্যায় ঐ শব্দটির প্রযোজ্যতা নিয়ে বিচার সহজতর হয়। আগে একটি প্রবন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছি যে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের চরিত্র নিয়েও পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের ভিতরে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। আধুনিক বাংলা তথা ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে রেনেসাঁস শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে ; সম্প্রতিকালে অনেকে সেই প্রয়োগকে অসংগত মনে করেছেন, কিন্তু এইসব বিবরণ ও বিতর্কে রেনেসাঁস কথাটি ঠিক কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব স্পষ্ট নয়। যেটি বোঝা যায় সেটি হল যে আলোচকদের মনে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে কোনো একটি প্রচলিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত, এবং সেটিকে অবলম্বন

করেই তাঁরা আধুনিক বাংলার তথা ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর উপরে রেনেসাঁস শব্দটির আরোপ সংগত বা অসংগত সেটি নির্ণয় করেছেন। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের উদাহরণকে স্মরণে না রেখে রেনেসাঁস সম্পর্কে আলোচনা অন্তঃসারহীন। ঐ উদাহরণ ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা বিচার করে রেনেসাঁস সম্পর্কে আমার মনে যে ধারণাটি গড়ে উঠেছে তার কিছুটা পরিচয় আগের প্রবন্ধে দেবার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয় উনিশ-শতক জুড়ে এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে বঙ্গদেশের মানসজীবনে যা ঘটেছিল তাকে সেই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত। কেন তা মনে করি এই প্রবন্ধের সেটিই মুখ্য আলোচ্য। যাঁরা তা মনে করেন না রেনেসাঁস সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্ত বা নিহিত ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার কোথায় মৌলিক পার্থক্য সেটি গোড়াতেই সংক্ষেপে আরেকবার বলা দরকার। তাতে যে তাঁদের ধারণায় অথবা সিদ্ধান্তে পরিবর্তন ঘটবে এমন দুরাশা আমার নেই। কিন্তু তথ্যবিচারের জন্য ধারণার স্পষ্টতা যে জরুরী, একথা সম্ভবত তাঁরাও স্বীকার করবেন, এবং যাঁরা আমার ধারণাকে গ্রহণীয় মনে করবেন তাঁদের তখন বিচার্য হবে এই ধারণার ভিত্তিতে আমার সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিসংগত আর কতটাই বা তথ্যসমর্থিত।

পশ্চিমে যা ঘটেছিল তা যদি স্মরণে রাখি তাহলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে সমাজবিপ্লব অথবা সর্বোদয় জাতীয় ব্যাপার ইতালীয় রেনেসাঁসে ঘটে নি। সামাজিক-রাষ্ট্রিক-আর্থিক সংগঠনের সর্বব্যাপী, দ্রুত, আমূল, নাটকীয় রূপান্তরের অপর নাম বিপ্লব। পশ্চিমে তার যে দুটি আদিরূপ পাওয়া যায়—ফরাসীবিপ্লব এবং ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব—তার মধ্যে কোনটিই রেনেসাঁসের সমকালীন নয়। তারা ঘটে পরবর্তীকালে ইয়োরোপের অন্যদেশে। বিপ্লবের এই দুটি আদিরূপের সঙ্গে রেনেসাঁসের ইতালীয় আদিরূপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে ঐতি-হাসিকরা আমাদের অবহিত করেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটিও মনে রাখা দরকার যে রেনেসাঁস হওয়া সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড অথবা ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনীয় প্রাতিষ্ঠানিক অথবা প্রাযুক্তিক বিপ্লব ইতালিতে রেনেসাঁসের পরেও দীর্ঘকাল অসংঘটিত। ফলত সমাজবিপ্লব রেনেসাঁসের না অপরিহার্য অঙ্গ, না আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু বিপ্লব ঘটে নি এই কারণে ইতালীয় রেনেসাঁসের স্বকীয় মূল্য কি হ্রাস পায়? তা যদি না পায়

তাহলে উনিশ-শতকী বাংলায় সমাজবিপ্লব ঘটে নি বলে সেক্ষেত্রে রেনেসাঁস আখ্যার প্রয়োগ অসংগত হয় না।

সর্বোদয় রেনেসাঁসের উদ্দিষ্ট হতে পারে, কিন্তু পনের শতকের ইতালিতে মানবীয় সৃজনশক্তির যে অসামান্য উচ্ছ্রয় দেখা যায় তাতে যাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন ইতালীয় জনসমষ্টির তাঁরা ছিলেন এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র। বস্তুত ইতিহাসে এমন কোনো পর্ব বা যুগ আমাদের জানা নেই যখন একই সঙ্গে কোন সমাজের সমস্ত এমনকি অধিকাংশ অধিবাসী সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উদ্যমে স্বেচ্ছানিযুক্ত অথবা সেই বিকাশের সমানভাবে ফলভাগী। রেনেসাঁস যতো অসামান্য ব্যাপারই হোক না কেন সেখানেও এই সূত্রের ব্যতিক্রম দেখি না। অন্যদেশে বা পূর্ববর্তী কোন যুগে এতগুলি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রায় একই সময়ে সার্থক আত্মপ্রকাশের উদ্যোগে নিবিষ্ট দেখা যায় না—ইতালীয় রেনেসাঁসের এটিই বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সর্বসাধারণকে তাঁরাও নিজেদের সৃষ্টিশীল উদ্যোগে টানতে পারেন নি। একে যদি ত্রুটি ভাবা হয় তাহলে সে অভিযোগ উনিশ-শতকী বাংলার মতো পনের শতকী ইতালি সম্পর্কেও প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় যে দিকটি লক্ষণীয় সেটি হল, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা সাংস্কৃতিক স্বয়ম্ভরতা রেনেসাঁসের অপরিহার্য শর্ত নয়। পনের শতকের ইতালি শুধু বহুবিভক্ত ছিল না, তার বেশ কিছুটা অংশই অনিতালীয় শাসকদের অধীন ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ ছিল তৎকালীন নাগরিকদের নিত্য-সঙ্গী; ইতালির অনেক অঞ্চলই ছিল বিভিন্ন একনায়কতন্ত্রের অধীন। তাছাড়া যেসব সূত্র থেকে ইতালীয় রেনেসাঁস তার বিচিত্র উপাদান আহরণ করে তাতে নতুন প্রাণ দেয় এবং অর্থসমৃদ্ধি ঘটায়, তাদের মধ্যে অনেকগুলিকেই ইতালি তার স্বকীয় ঐতিহ্য থেকে পায় নি। আরব ও গ্রীক সংস্কৃতি ইতালির উজ্জীবনে প্রভূত দান করে। আরব সভ্যতা বহিরাগত আর দীর্ঘ যুগের বিচ্ছেদের ফলে প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতি রেনেসাঁসী ইতালিতে অভিনব উৎসরূপেই পুনরাবিষ্কৃত হয়। বস্তুত কোনো সমাজ অথবা সংস্কৃতির শুধু ভিতর থেকেই চাপের সূত্রে বিকাশ কতটা সম্ভব সভ্যতার ইতিহাসপাঠে সে বিষয়ে আমাদের সংশয় জন্মায়। বিশুদ্ধ ও সমসত্ত্ব ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন আদিজাতিদের মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত বিকাশ প্রায় স্তব্ধ। আদিবাসীদের পুরাণ থাকে, কিন্তু পরিবর্তনের মন্থরতা ও

স্বল্পতার ফলে তাদের ইতিহাসচেতনা গড়ে ওঠে না। যেসব কারণে কোনো সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটে তাদের মধ্যে অন্তত একটি হল অন্য বলিষ্ঠ সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে লেনদেন ও ঘাতপ্রতিঘাত। ইতালি নিয়েছিল মুখ্যত আরব এবং গ্রীকদের কাছ থেকে ; আবার ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড নেয় ইতালির কাছ থেকে এবং পরস্পরের কাছ থেকে। তবে অপরের কাছ থেকে নিতে পারা এবং তাকে আত্মস্থ করে উপাদানসমূহকে সমৃদ্ধতর রূপ দেওয়া এক জিনিস, আর অধিকতর শক্তিশালী সমাজসভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করা কিংবা তার প্রবল চাপে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। দ্বিতীয় ব্যাপারটি যে কত ট্র্যাজিক অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষ করেছি ; স্বাধীন ভারতবর্ষে বহু আদিজাতির ক্ষেত্রেও এই ট্র্যাজেডি ঘটেছে।

কিন্তু পনের শতকের ইতালি বা উনিশ-শতকের বাংলার ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। বঙ্গদেশ বিদেশীর অধীন ছিল ; বাঙালি ভাবুকরা ইংরেজির সূত্রে পশ্চিমী চিন্তার জগৎ থেকে বহু উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনেকের মধ্যে যে অসামান্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি চোখে পড়ে এবং সেইসব ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকলাপ ও প্রকাশের ভিতর দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে বিস্ময়কর সমৃদ্ধি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে, নিজমূল্যে এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যে তা পনের শতকের ইতালীয় রেনেসাঁসকেই স্মরণ করায়।

তৃতীয়ত, নগরসভ্যতার পটভূমি ছাড়া রেনেসাঁস অকল্পনীয় বটে, কিন্তু পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সঙ্গে রেনেসাঁসের কার্যকারণ সম্পর্ক যেমন অপ্রতিষ্ঠিত তেমনি রেনেসাঁসের মানসসম্পদ রচনায় বণিক ব্যবসায়ীদের ভূমিকা নিতান্তই অনুল্লেখ্য। লাবান্দে, লোপেজ প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন চোদ্দ এবং পনের শতকে ইতালিতে আর্থিক অবক্ষয় ও মন্দার লক্ষণ সুস্পষ্ট। ইয়োরোপ থেকে ভারতবর্ষে যাতায়াতের সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত ও উন্মুক্ত হবার পর (১৪৯৮) ভেনিস ও জেনোয়ার বাণিজ্য দ্রুত হ্রাস পায়, ফ্লোরেন্সের বৈষয়িক অবক্ষয় ঘটে। অবশেষে ১৫৩০ সালে ইতালির বেশির ভাগ অঞ্চল স্পেনের দখলে আসে। কিন্তু ইতালির সেই আর্থিক-রাজনৈতিক পতনের কালেও মহাপ্রতিভাধর মিকেলাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) নিত্যনূতন সৃজনকর্মে ব্যাপৃত ; চিত্রশিল্পে অপূর্ব

সংযোজনের পর সংযোজন করে চলেছেন তিত্সিয়ানো (১৪৭৭-১৫৭৬), করেজিও (১৪৯৪-১৫৩৪), তিনতোরেত্তো (১৫১৮-৯৪), ভেরোনিজ (১৫২৮-৮৮); স্বর্ণকার, ভাস্কর, বহুবেত্তা ও বহুবল্লভ অ্যাডভেনচারার বেনভেনুতো চেলিনি (১৫০৫-১৫৭১) লিখছেন তাঁর অমর আত্মজীবনী; আরিওস্তোর (১৪৭৪-১৫৩৩) অসামান্য কবিকৃতির অনুসরণ করছেন তর্কুয়াতো তাসো (১৫৪৪-৯৫); তীক্ষ্ণ, জ্বালাময়, বিদ্রূপাত্মক রচনাকে অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করে অর্থ, প্রতিপত্তি ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন পারদপ্রতিম পিএত্রো আরেতিনো (১৪৯২-১৫৫৬); আত্মা যে একইসঙ্গে দেহের বৃত্তিমাত্র অথচ সৃজনক্ষম, এই প্রকল্পের ভিত্তিতে মানবতন্ত্রী দর্শন রচনা করছেন জ্যাকোমো জাবারেল্লা (১৫৩২-৮৯); অনাদি, অনন্ত, কেন্দ্রহীন, পরিধিহীন, নিয়ত গতিশীল, অসংখ্য সৌরমণ্ডলসম্পন্ন, নিয়মনিয়ন্ত্রিত মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অন্ধ অসহিষ্ণু চার্চের বলি হচ্ছেন জ্যোর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০); আর ইয়োরোপীয় সংগীতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছেন মহৎ সুরকার পালেস্ত্রিনা (? ১৫২৫-৯৪)। তবু এ-তো সূর্যাস্তকাল। রেনেসাঁসী প্রভাতে, দ্বিপ্রহরে, অপরাহ্ণে যাঁদের প্রতিভা ইতালিকে স্বর্ণকরোজ্জ্বল করে রেখেছিল সেইসব ভাবুক ও সাহিত্যিক—পেত্রার্কা, বোকাচ্চো, ভালা, ফিচিনো, পিকো, পম্পনাজ্জি, মাকিয়াভেলি, কাস্তিলিওনে; সেইসব শিল্পী—ব্রুনেলেশ্কি, দোনাতেলো, উচ্চেলো, পিসানেলো, মাসাচ্চো, বেলিনি, মান্তেনিয়া, বত্তিচেলি, লেওনার্দো, রাফায়েলো—নগরবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কি বণিক ব্যবসায়ী? ইতালিতে রাত্রি নামবার আগেই রেনেসাঁসের বীজ ইয়োরোপের উত্তরে ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে, আর সেইসব অঞ্চলে অন্যান্য ঘটনার সহযোগে যে প্রস্ফুরণ ঘটে পরবর্তীকালে তার প্রভাব সারা পৃথিবীতেই ব্যাপ্ত হয়।

ফলত মনস্বিতাই যে রেনেসাঁসের উৎস এবং কোনো সমাজে একই অথবা কাছাকাছিকালে বহু মনস্বীজনের সক্রিয় উপস্থিতির প্রকাশই যে প্রকৃত রেনেসাঁস—ভাসারির এই প্রত্যয়ের গূঢ়ার্থ অনুধাবন করা আমাদের আলোচনার পক্ষে বিশেষ জরুরী। মানুষ অন্য পশুদের মতো শুধু বংশবৃদ্ধি করে না। সৃজন সামর্থ্য তার প্রাজাতিক বৈশিষ্ট্য, এবং এই সামর্থ্যের বিকাশই তাকে ইতিহাসের রচয়িতা করতে পারে। মানুষের বিশিষ্ট শারীরবৃত্ত, বিশেষ করে তার গুরুমস্তিষ্ক,

মেরুদণ্ড, চক্ষু, বাগযন্ত্র এবং হাতের গঠন তাকে সৃজনের, স্বাধীনতার এবং ইতিহাস রচনার সামর্থ্য দিয়েছে। কিন্তু সামর্থ্য থাকলেই তার বাস্তবায়ন ও বিকাশ অবশ্যম্ভাবী নয়। বাস্তবায়নের জন্য চাই নির্বিশঙ্ক উদ্যোগ ও অক্লান্ত নির্মিৎসা, নিবিষ্ট উদ্ভাবন ও অমিত কল্পনা, নিরবচ্ছিন্ন জিজ্ঞাসা ও অধ্যবসায়, এবং বিকাশের জন্য চাই সচেতন অনুশীলন ও অব্যভিচারী দায়িত্ববোধ আর তারই সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আপেক্ষিক অনুকূলতা। তবে কিছু ব্যক্তির মধ্যে মানসিক গুণগুলি প্রবল হলে প্রতিকূল পরিবেশকেও মানুষ অনেক সময় নিজের আয়ত্তে আনতে পারে।

জিজ্ঞাসা, কল্পনা, উদ্ভাবনা প্রভৃতি গুণাবলী যাঁদের মধ্যে প্রবল তাঁরা মনস্বী, এবং মানুষের ইতিহাস নির্মাণে তাঁদের কেন্দ্রীয় ভূমিকার স্বীকৃতি ছাড়া রেনেসাঁসের কোনো ব্যাখ্যাতেই অভিজ্ঞতা ও যুক্তির সমর্থন মেলে না। তবে মানুষের মধ্যে বহু পৃথক এবং অনেকক্ষেত্রে স্ববিরোধী প্রকৃতি ও প্রয়োজন বর্তমান। স্বাধীনতা ও জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেমন মানুষের সহজাত, নিরাপত্তা ও নির্ভরতার প্রয়োজনও তেমনি অনস্বীকার্য। জিজ্ঞাসার পাশাপাশি আছে অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামি; অনুশীলন ও উদ্যোগের পাশাপাশি জড়তা ও আলস্য; সৃষ্টির পাশাপাশি ধ্বংসের প্রবণতা; যা আছে তাকে আপন চেষ্টায় অতিক্রম করবাব আগ্রহের পাশাপাশি আছে বিদ্যমানকেই নিত্য বলে মেনে নেওয়ায় মূঢ়তা। মনস্বীরা প্রথম দিকগুলিকে তাঁদের জীবনচর্যায় প্রাধান্য দেন বলেই তাঁরা মনস্বী। মানুষের বিকাশের ইতিহাসে তাঁদের কৃতির স্থানকালোর্ধ মূল্য সুপ্রত্যক্ষ। সফক্লিস বা কালিদাস, তাঙ্‌ যুগের মৃৎপাত্রনির্মাতা, অথবা অজন্তার গুহাচিত্রের শিল্পীবৃন্দ, আরিস্টটল, ইউক্লিড অথবা ইব্‌ন্‌ খালদুন বহুদূরের ও দীর্ঘকালের ব্যবধান পেরিয়ে আজও আমাদের বিস্ময়, সমৃদ্ধিসাধন ও প্রেরণার উৎস। তবু এটিও লক্ষণীয় যে তাঁদের সমকালীন প্রভাব ও সামাজিক ফলপ্রসূতা অনেকখানিই নির্ভর করে তাঁদের সংখ্যা ও ব্যক্তিগত সামর্থ্য এবং তৎকালীন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার উপরে। মনস্বিতার অর্জিত সম্পদ প্রজননের সূত্রে উত্তরপুরুষে বর্তায় না। সেই সম্পদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ এবং শিক্ষার সূত্রে তার বিকিরণের ফলেই তা পরবর্তীকালের উত্তরাধিকার হতে পারে।

এই কারণে মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নকালে সভ্যতার উত্থান-পতন অপ্রত্যাশিত বা আপতিক নয়। কোনো সমাজে বহু মনস্বীব্যক্তির সমকালীন ও আনুপদিক উপস্থিতি ও পারিবেশিক অনুকূলতা—বহিরাগত প্রাণবন্ত সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রবেশ ও তার সম্ভাবনাপূর্ণ উপাদানাবলীর স্বীকরণের ব্যবস্থা যে আনুকূল্যের অন্যতম দিক—সে সমাজে সেই কালে সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রস্ফুরণ ঘটায়। যতদিন সে সমাজে জিজ্ঞাসা, কল্পনা, উদ্ভাবনা, উদ্যোগ, সৃজনশীলতার চর্চা অব্যাহত থাকে ততদিন সে সমাজ বিকাশশীল। কিন্তু অব্যাহত থাকবার কোনো নিশ্চিত প্রত্যাভূতি মানুষের চরিত্রে, সমাজে বা ইতিহাসে মেলে না। শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ অথবা অন্তর্যুদ্ধের ফলে নয়, মানুষের রচিত ধ্যানধারণা ও সমাজব্যবস্থার বহুবিধ ত্রুটি এবং মানসিক আলস্য, গড্ডলিকাবৃত্তি, পরানুকরণপ্রবণতা, নিরাপত্তার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি, পরিবর্তনবিমুখতা প্রভৃতি দুর্মর চারিত্রিকের সমাবেশের ফলেও সমাজ জড়তাক্রান্ত হতে পারে। কোন সমাজে বেশ কিছু সময় ধরে মানসিক-সামাজিক জড়তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত থাকার পর যখন আবার সেই সমাজে লক্ষণীয় সংখ্যক ব্যক্তি মনস্বিতার উজ্জীবনে আত্মনিয়োগ করেন তখন সেখানে যা ঘটে—তারি নাম রেনেসাঁস। এই উজ্জীবন কোনো বিশেষ সমাজে বিশেষ কালে ঘটবেই তার যেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, যেসব উদ্দীপকের সমাবেশ এই উজ্জীবনের সহায়ক সেগুলিও সব ক্ষেত্রে এক নয়। তবে পূর্ববর্তী জড়াবস্থার সঙ্গে তুলনামূলক বৈষম্য যেমন রেনেসাঁসকে চিহ্নিত করে, তেমনি একদিকে প্রাক্‌কালীন প্রস্ফুরণ থেকে সচেতন বিচার-বিকল্পের প্রয়োগের সূত্রে প্রেরণাসংগ্রহ ও অন্যদিকে দূরাগত সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে নির্বাচিত উপাদানাবলীর স্বীকরণের শক্তি রেনেসাঁসের সাধারণ লক্ষণ।

রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে মানুষ তার প্রাতিস্বিকতা ও আস্তিত্বিক স্বাধীনতার প্রমাণ দেয়। ঐতিহ্য-নিয়ন্ত্রিত নয়, পরমুখাপেক্ষী নয়, স্বনির্ভর ও বিবর্ধনমুখী ব্যক্তিত্বের সাধনাই রেনেসাঁসের প্রাণ। স্বাধীন ব্যক্তিও অবশ্যই অতীত থেকে এবং অপর থেকে গ্রহণ করেন; কিন্তু বহু সূত্র থেকে উপকরণ নিয়ে যা কিছুরই তিনি নির্মাতা তার বিশিষ্টতার ভিতরে একান্তভাবেই তিনি নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এই সাধনা ও স্বাক্ষর নানাভাবে প্রকাশিত—তাঁর জীবন-

চর্যায়, নব নব রূপের কল্পনায় ও বহিরায়ণে, অন্তর ও বহির্জগতের বিষয়ে অদম্য প্রশ্নশীলতায়, মূল্যাবলী ও নৈতিক নির্ণায়কের বিচারে ও সংস্কারে, নূতন নূতন সাধনী ও প্রযুক্তি-প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সমাজ-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কাদির বিরচনে। এইসব উদ্যম-উদ্যোগ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বটে, কিন্তু এদের আলোচনায় অন্তত তিনটি দিক বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। প্রথমত, এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কার্যকারণভিত্তিক নয়। রূপায়ণের প্রকাশ যে শিল্পকর্মে, জিজ্ঞাসার প্রকাশ যে দর্শন-বিজ্ঞানে, মূল্যবিচারের প্রকাশ যে দায়িত্বশীল নৈতিকতায়, সাধনী-প্রযুক্তির উদ্ভাবনার সূত্রে যে সম্পদবৃদ্ধি, এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের সূত্রে যেসব নূতন রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ—তারা কেউই একে অপরের কারণ বা ফল না-ও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, মানবীয় সামর্থ্যের প্রোজ্জ্বল প্রকাশ এইসবকটি ক্ষেত্রে একই সময়ে ক্বচিৎ ঘটে থাকে। চিত্রকলার মহৈশ্বর্যময় যুগে রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা ও আর্থিক অবক্ষয়ের উদাহরণ আমরা ইতালির ক্ষেত্রে দেখেছি। সুইট্জার-ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রিক-আর্থিক বিন্যাসের উৎকর্ষ সুবিদিত, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে-দেশের নিজস্ব দান নিতান্তই অল্প। (যদিও বহু শিল্পী ও ভাবুক সে-দেশে আশ্রয় পাওয়ার ফলে আপন-আপন সামর্থ্যকে প্রকটিত করতে পেরেছিলেন)। বিপ্লবোত্তর রুশদেশে আর্থিক-প্রাযুক্তিক উন্নতি সাধিত হলেও বিপ্লবপূর্ব রুশের তুলনায় সেখানে শিল্পসাহিত্যের বন্ধ্যাদশা গত পঞ্চাশ বছর ধরে নিরতিশয় পরিদৃষ্ট। তৃতীয়ত, শিল্পসাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, মূল্যবোধ ও বিবেকিতার প্রস্ফুরণ নিজগুণেই মূল্যবান্ বটে, তবু যথোপযোগী সমাজ-বিন্যাস ও প্রাযুক্তিক উৎকর্ষের সমর্থন না পেলে এই প্রস্ফুরণ সাধারণ মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু সর্ব-সাধারণের উপরে প্রভাব না ফেললেও এই প্রস্ফুরণকে রেনেসাঁস বলা সংগত যদি (ক) অব্যবহিত পূর্বের ব্যাপক জড়তার সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য অনস্বীকার্য ঠেকে ; (খ) যদি দু'একজন নয়, একই সঙ্গে ও ধারাবাহিক-ভাবে লক্ষণীয়সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সেই প্রস্ফুরণ দেখা যায় ; (গ) এবং যদি তারি ফলে প্রচুর পরিমাণে এমন মানসসম্পদ রচিত হয় যা স্থায়ীমূল্যের ধারক এবং যা পরবর্তীকালের মানুষদের প্রেরণা দিতে সক্ষম। ইতালীয় রেনেসাঁস এই ত্রিবিধ লক্ষণান্বিত যদিও তার

ব্যাপক সামাজিক বিকিরণ ঘটে স্বদেশে বা স্বকালে নয়, অন্যদেশে এবং কিছুটা পরবর্তী সময়ে। পশ্চিম ইয়োরোপে রেনেসাঁসের প্রসারে ও প্রতিষ্ঠায় ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র ও প্রযুক্তিবিপ্লব বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রেনেসাঁসের মানস-ঐশ্বর্য প্রথম প্রস্ফুরিত হয়েছিল ইতালিতে সেখানকার শিল্পী ও ভাবুকদের মধ্যে। আর এই প্রস্ফুরণের কাহিনী লিখতে গিয়েই রেনেসাঁস আখ্যাটিকে নির্বাচন করেছিলেন জর্জো ভাসারি।

দুই

বিশ শতকের শেষভাগে দাঁড়িয়ে উনিশ-শতক ও বিশ শতকের প্রথমভাগের অবিভক্ত বাংলার দিকে চাইলে যা প্রবলভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল বাঙালি মনস্বিতার ঐ প্রায় সার্ধশতাব্দীব্যাপী বিস্ময়কর প্রকাশ। কী এর কারণ, কোথায় তার সীমা ও ত্রুটি, কেন তা আজ প্রায় অবসিত, কী কী তার ব্যাখ্যাগত সমস্যা—এসব নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিচার অবশ্যই জরুরী, কিন্তু নিতান্ত জড়ধী না হলে এই অসামান্য সংঘটনকে অগ্রাহ্য করা একেবারেই অসম্ভব। শুধু যাঁরা বাংলাদেশে জন্মেছেন এবং বড়ো হয়েছেন তাঁরাই নন, কেরল থেকে কাশ্মীর, গুজরাত-মহারাষ্ট্র থেকে উড়িষ্যা-আসাম এই উপমহাদেশের অন্য অঞ্চলগুলির বহু শিক্ষিতজনও সার্ধশতাব্দী-ব্যাপী বাংলার এই উজ্জীবন সম্পর্কে কমবেশী সচেতন, তার মানস-সম্পদের উত্তরাধিকারী ও তার দ্বারা কমবেশী অনুপ্রাণিত। ব্রাত্য ও প্রত্যন্তনিবাসী বঙ্গীয় ভাবুকরা উনিশ-শতকে তাঁদের প্রচীয়মান মননের যে বিভব আসমুদ্রহিমাচল ছড়িয়েছিলেন—যার সাক্ষ্য মেলে লোক-হিতবাদী, তেলাঙ্গ, রানাডে, গোখলে, বীরেশলিঙ্গম পণ্টুলু, ভেঙ্কটরত্নম, নর্মদশঙ্কর, করসনদাস মূলজি, সোরাবজি শাপুরজি বেঙ্গালি, বেহরামজি মালাবারি, বরোদার গায়কোয়াড় প্রভৃতির রচনায় এবং/অথবা কার্যকলাপে—ব্যাপকতা ও সাংস্কৃতিক ফলপ্রসূতার বিচারে তা এই অঞ্চলের দীর্ঘ ইতিহাসে তুলনাবিরহিত, এবং একথা পালযুগ ও চৈতন্য-যুগের কথা স্মরণে রেখেই বলা চলে। বরং এরি তুলনা মেলে জার্মানি, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যাণ্ডের উপরে রেনেসাঁসী ইতালির মানস প্রভাবের কাহিনীর ভিতরে।

বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের

রাজধানী হিসেবে কলকাতা শহরের উদ্ভব ও বিকাশ, মুখ্যত বাঙালি হিন্দু উচ্চবর্ণের পুরুষদের ইংরেজী শিক্ষায় আগ্রহ এবং সম্প্রসারণশীল সরকারী ব্যবস্থায় এই শিক্ষিতজনদের নিয়োগ—এসবই বাঙালির মানস-উজ্জীবনে এবং ভারতব্যাপী প্রভাববিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এসব তথ্যের দ্বারা ঐ উজ্জীবনের মূল্য ও প্রভাবের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত অথবা অভিগ্রস্ত হয় না। যেসব নির্ণায়কের বিচারে সার্ধশতাব্দীব্যাপী এই সংঘটনকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া সংগত, তাদের ভিতরে কয়েকটি সংক্ষেপে উল্লেখ করি।

উনিশ-শতকের বাংলার সঙ্গে পূর্ববর্তী শতকের বাংলার তুলনিক বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। মুষ্টিমেয় বহিরাগত ভাগ্যান্বেষীর প্রায় অপ্রস্তুত আক্রমণের সামনে আত্মরক্ষার অসামর্থ্যই শুধু নয়, অনুকূল নানা উপাদানের উপস্থিতি সত্ত্বেও বিকাশোদ্যমের অভাব পূর্ববর্তী শতকের মানসিক জড়তার করুণ প্রমাণ। বঙ্গদেশের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিচায়ক ও ধারক বাংলা ভাষা কয়েক শতক পূর্বেই নিজস্ব চরিত্র অর্জন করে; কিন্তু সেই অশেষ সম্ভাবনাশালী ভাষাতে রচিত সাহিত্য কয়েক শতাব্দী ধরে সীমাবদ্ধ থাকে মুখ্যত কিছু ধর্মীয় গীতি-কবিতা এবং আখ্যানকাব্যের ভিতরে। বিষয়বস্তুতে, আকারে, রীতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা উদ্ভাবনার বদলে মৌলিকতার অনুপস্থিতি এবং পুনরাবৃত্তি সে সাহিত্যে প্রকীর্ণ। বাংলার অধিকাংশ মানুষ তখনো গ্রামবাসী এবং কৃষিনির্ভর থাকলেও এই নাব্য অঞ্চলে নগর বন্দর একেবারে ছিল না এমন নয়। কিন্তু জাহাজ, নৌকো, তাঁতি ও অন্যান্য কারিগর কুটিরশিল্পী, বণিক ব্যবসায়ী, ভিনদেশী খরিদ্দার ও দেশী হাটবাজার, টোল-মাদ্রাসা, এসব থাকা সত্ত্বেও কী জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে, কী প্রযুক্তি-প্রক্রিয়ায়, কী সমাজ-সংগঠনে, নীতিবোধ বা আচার-আচরণে মোগল বাংলায় উদ্ভাবনার, বিকাশের, গতিশীলতার লক্ষণ বড়ো একটা চোখে পড়ে না[১]। সর্বত্র নিষেধের পরে নিষেধ, ভাগ্যের উপরে নির্ভরশীলতা ও আত্মপ্রত্যয়হীনতা, হৃতসামর্থ্য প্রথাপ্রকরণের নির্বোধ অনুসরণ, জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলহীনতা, বিনিয়োগবিমুখ অপচয়, মানসিক জাড্য, ও নিরভিযানী ভোগবৃত্তি। পলাশিতে যেভাবে প্রায় বিনা প্রতিরোধে রাজ্যজয় ঘটে ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। পলাশির অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলার

দুর্গতি চরমে ওঠে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এই অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মৃত্যুর জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যতটা দায়ী বাংলার সমাজ-সংগঠন, জীবনচর্যা ও পরম্পরাশ্রয়ী প্রতিন্যাস তার চাইতে নিতান্ত কম দায়ী নয়।

উনিশ-শতকে গ্রামবাসী সাধারণ বাঙালির জীবনযাত্রায় কতটা এবং কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল তা আরো অনুসন্ধান সাপেক্ষ[২], কিন্তু নাগরিক বাংলার মানসজীবনে যে নূতন নানা সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ চোখে পড়ে। প্রথম উল্লেখ্য এক বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের উদ্ভব। পরম্পরা, ভক্তিবাদ এবং প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজে উনিশ-শতক জুড়ে লক্ষণীয়সংখ্যক কিছু মানুষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যাঁরা একই সঙ্গে স্বনিয়ন্ত্রিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে কৌতূহলী, যাঁরা অতীতের উত্তরাধিকারকে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে বিচার করতে এবং সেই বিচারের ভিত্তিতে তা থেকে উপাদান গ্রহণ-বর্জনে সমর্থ, যাঁরা সমাজের ভিতরে বাস করেই দুর্মর লোকাচারের বিরোধিতা করতে প্রস্তুত, যাঁরা বিবেকিতার মূল্য হিসেবে পারক্যের যন্ত্রণাকে অন্তত কিছুকালের জন্য মেনে নেবার মতো সাহসী, যাঁরা উদ্যোগী, মুক্তবুদ্ধি, উদ্ভাবনাশীল, একই সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত প্রাণ[৩]। উনিশ এবং বিশ শতকী বাংলার সামাজিক ইতিহাসে যাঁদের 'ভদ্রলোক' অথবা 'বাবু' বলা হয় এই ব্যক্তিরা তাঁদের ভিতর থেকেই উদ্ভূত বটে, কিন্তু চরিত্র লক্ষণের দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে এঁদের একীকরণ অসংগত। ইতিহাসে অস্মিতা ও ভাবুকতার ভূমিকাকে বিশেষ মূল্য না দেওয়ার ফলে মিশ্র, শীল, ব্রুমফিল্ড্‌ প্রমুখ সমাজ-ঐতিহাসিক থেকে শুরু করে এদেশী মার্কস-পন্থীদের অনেকেই এই ভ্রান্ত একীকরণ করেছেন[৪]। অস্মিতা-সম্পন্ন এই ব্যক্তিরা মুখ্যত হিন্দু 'উঁচুজাতি' থেকে এসেছেন ঠিকই, ইংরেজী জ্ঞান তাঁদেরও আর্থিক উন্নতির প্রধান সূত্র, জমিদারি উপস্বত্ব ব্যবস্থা থেকে তাঁরা অনেকেই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হন নি, এবং জীবিকার জন্য তাঁরা হয় সরকারী বা বে-সরকারী চাকুরে, নয় কোনো না কোনো নির্দিষ্ট পেশা অবলম্বনকারী। কিন্তু যে বাবুদের বর্ণনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—'যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করিবেন, উপার্জনের জন্য বিদ্যাধারণ করিবেন, বিদ্যাধারনের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাহারাই বাবু', 'যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে,

তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণীতে বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু'—, 'যাঁদের মেরুদণ্ডহীন মানসিকতা সম্পর্কে আমাদের যৌবনকালে নির্মম ব্যঙ্গ-কবিতা লিখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, যাঁদের সমকালীন আত্মভূমিক বিদ্য-মানতা আমরা শহরে মফস্বলে নিয়ত টের পাই, তাঁদের কোঠায় কি রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, অক্ষয়কুমার, রাধানাথ সিক্‌দার, হরিশ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম, কেশবচন্দ্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, দুর্গামোহন দাস, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শশীপদ বন্দ্যো-পাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিদের আদৌ ফেলা চলে ? বাবু বা ভদ্রলোকের মতো এঁরা ইতিহাসের ভোগবৃত্ত উপাদান নন, এঁরা ইতিহাসের কমবেশী সচেতন রচয়িতা। প্রাতিস্বিকতা, অনন্যতা, স্বনির্ভরতা, আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য, ঐতিহ্য ও লোকাচারকে নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা যাচাই করে নেবার সাহস ও শক্তি, স্বনির্বাচিত কর্মে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগের দৃঢ়তা প্রভৃতি চারিত্রিক এঁদের এবং এই ধরনের আরো বেশ কয়েকজনকে যেভাবে অস্মিতামণ্ডিত করেছে তাকে মূল্য না দিলে উনিশ-শতকের মানসসমৃদ্ধির কোনো অর্থবহ ব্যাখ্যা মেলে না।

এই নতুন ব্যক্তিত্বের প্রথম প্রকাশ ঘটে রামমোহনে। অসাধারণ মনস্বিতাসম্পন্ন এই মানুষটিকে খাটো করে দেখাবার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্প্রতিকালে লক্ষণীয় তা আমাদের ঐতিহাসিক বোধের নয়, মানসিক অবক্ষয়েরই নির্দেশক[৫]। ইংরেজের চাকরী, মহাজনী, জমিদারী ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁকে সমকালীন ভদ্রলোকদের সামিল মনে হতে পারে ; কিন্তু এসবকে নিয়ে অথচ এদের ছাড়িয়ে ছাপিয়ে বহুদিকে উদ্ভাসিত তাঁর অনন্যতা। সমকালীন ভদ্রলোকদের মধ্যে আর কোন্ ব্যক্তি তিরিশে পৌঁছে প্রকাশ করেছেন 'তুহ্‌ফাত্‌-উল-মুওয়াহ্‌হিদিন'-এর মতো প্রোজ্জ্বল ম্যানিফেসটো যার প্রতি পৃষ্ঠায় দ্ব্যর্থ্যবিহীন যুক্তিশীলতা, বৈশ্বিকতা ও স্বাধীনতাপ্রীতি বিঘোষিত ? ঐতিহ্য, অভ্যাস, প্রচলিত ধ্যানধারণা, দেশকালাশ্রিত সংস্কার ও পুরুত-মোল্লাদের প্রাধিকারকে অস্বীকার করে আর কোন মধ্যবিত্ত পরিণতবয়স্ক 'বাবু' নিজের বুদ্ধিবিবেককেই জ্ঞান ও ঔচিত্যের নির্ভরস্থল বলে উপস্থিত করেছেন ? ফ্রেডেরিক হ্যামিলটনের অসম্মানজনক

আচরণের বিরুদ্ধে মিন্টোর কাছে লেখা প্রতিবাদ-পত্র (১৮০৯), বিগ্রহের সেবার জন্য জমি দেওয়ার পরিবর্তে দরিদ্রের সাহায্যের জন্য জননীকে নিজের উপার্জন থেকে পর্যাপ্ত অর্থ দেওয়ার বিবেকী প্রস্তাব, ভারতীয় সমাজে নারীদের পরম্পরা-সমর্থিত লাঞ্ছনার উদ্‌ঘাটন, এবং তাঁদের সুযোগবঞ্চিত সামর্থ্যাবলীকে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য নীতি ও যুক্তি সমর্থিত আবেদন, প্রেস অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে নিজের পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক স্মারকলিপি রচনা, আধুনিক শিক্ষার নিঃসঙ্কোচ সমর্থনে অ্যামহার্স্টকে লেখা বিখ্যাত চিঠি, সমান বৈদগ্ধ ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও খৃষ্টধর্মের বিচার ও ব্যাখ্যা এবং অতিপ্রাকৃত অধ্যাসাদির ভ্রান্তি উন্মোচন, দেশবিদেশের ভাবুকদের সঙ্গে চিন্তাবিনিময়ের বিশ্বনাগরিক উদ্যম, স্বোপার্জিত জ্ঞান ও উপলব্ধিকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করে বাংলা গদ্যের বলাধান, দূর-দূরান্তের মানবমুক্তি আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ ও অকুণ্ঠ সমর্থন, প্রবাসাজ্ঞা প্রথার সমালোচনা ও স্বাধীন চলাচলের অধিকার দাবি করে ফরাসীদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা পত্র—এসবেরই মধ্যে এমন একটি আত্মমর্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন, মুক্তবুদ্ধি, সুবেদী, বহুদর্শী, বিশ্বনাগরিক ও স্বপ্রকাশ অস্মিতা সক্রিয় যা আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌কে সংগত কারণেই মানবতন্ত্রী ভাবুক এরাজমুসের কথা স্মরণ করিয়েছিল। শুধু স্বদেশে নয়, দূরদেশেও যে তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব সমকালে স্বীকৃতি পায় তার অন্যতম প্রমাণ মেলে স্প্যানিশ উদারতন্ত্রীদের বিরচিত গঠনতন্ত্রের উৎসর্গপত্রে—“প্রশস্তহৃদয়, মহৎ, বিজ্ঞ, সদ্‌গুণসমন্বিত ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়ের প্রতি”। ১৮১৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *Abridgment of the Vedant* গ্রন্থের জার্মান অনুবাদ-সংস্করণ জেনা শহর থেকে প্রকাশিত হয় পরের বছর; *The Precepts of Jesus* গ্রন্থের মার্কিনী সংস্করণ নিউইয়র্ক থেকে বেরোয় কলকাতা সংস্করণের (১৮২০) মাত্র পাঁচ বছর পরে (১৮২৫)। সে যুগের সব চাইতে প্রভাবশালী মনীষী জেরেমি বেন্থাম তাঁকে স্বাগত করেন, ‘intensely admired and dearly beloved collaborator in the sevice of mankind’ আখ্যা দিয়ে।

যে অসামান্য অস্মিতার জন্য রামমোহন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আদি-পুরুষ—যার উপস্থিতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙালি পণ্ডিতবৃন্দ

অথবা রামমোহন-বিরোধীদের কারো মধ্যেই দেখা যায় না, তা কি সে রামরাম, মৃত্যুঞ্জয়, কি ভবানীচরণ বা রাধাকান্ত[৬]—তার প্রোজ্জ্বল ও প্রমিতাক্ষর সূত্র-নির্দেশ করে গেছেন রামমোহন-বিষয়ক বক্তৃতায় উইলিয়াম অ্যাডাম :

…… I was in the presence of a man of natural and inherent genius, of powerful understanding and of determined will, a will determined with singular energy and uncontrolable self-direction, to lofty and generous purposes. He seemed to feel, to think, to speak, to act as if he could not but do all this, and that he must and could do it only in and from and through himself, and that the application of any external influence, distinct from his own strong will, would be the annihilation of his being and identity. He would be free or not be at all…… Love of freedom was perhaps the strongest passion of his soul,—freedom not of action merely, but of thought……[৭]

এ সেই ধরনের স্ববশ, অনন্যতন্ত্র, সিসৃক্ষু, অমিত কৌতূহলী মহোদ্যোগী ব্যক্তিত্ব ইতালিতে যার প্রস্ফুরণের বিবরণ লিখেছিলেন ভাসারি, যাকে রেনেসাঁসের উৎস ও অভিজ্ঞানরূপে দেখেছিলেন বুর্কহার্ট ও কাসিরার, আমাদের কালে যার অতিবিরলতার হেতু বিশ্লেষণ করেছেন হানা আরেন্ট্, ডেভিড রীজম্যান প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক।

কিন্তু অসামান্য হলেও রামমোহন মোটেই উনিশ-শতকী কলকাতার একক ব্যক্তিত্ব নন। সমকালীন পত্র পত্রিকা, রামগোপাল সান্যাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, বাকল্যাণ্ড প্রমুখের বিবরণ, মন্মথনাথ ঘোষের লেখা জীবনীগ্রন্থগুলি, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, সম্প্রতিকালে সম্পাদিত বিভিন্ন জীবনীকোষ ইত্যাদি থেকে আমরা বহু খ্যাত ও স্বল্পখ্যাত বাঙালির পরিচয় পাই যাঁরা প্রত্যেকেই প্রাতিস্বিকতা-সম্পন্ন। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম প্রমুখ স্বরাট্ প্রতিভাধরদের কথা বাদ দিয়ে এমন দু'তিন জনের নাম উল্লেখ করি উনিশ-শতকী ব্যক্তিত্ববিকাশের ও স্বনির্মিৎসার প্রতিনিধি হিসেবে যাঁদের গণ্য করা চলে। ডিরোজিও-শিষ্য রাধানাথ সিক্‌দার (১৮১৩-১৮৭০) শুধু হিমালয়ের উচ্চতমশৃঙ্গের আবিষ্কর্তা নন, গণিত এবং ভূতাত্ত্বিক গবেষণা ও রচনা ছাড়াও তিনি স্বদেশীয় চারুকলা ও কারুকলার উজ্জীবনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। আবার মেয়েদের শিক্ষণ ও মনের মুক্তির জন্য প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগে 'মাসিক পত্রিকা'-ও তিনি প্রকাশ করেন। বিধবাবিবাহের সমর্থনে এবং শিশুবিবাহ ও বহুবিবাহের

বিরোধিতায় তিনি সক্রিয়। শক্তিমানের পায়ে তৈলদান 'বাবু'দের ধর্ম; কিন্তু রাধানাথ যখন নিম্নপদে সরকারী চাকুরে তখন স্থানীয় কুলির উপরে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের জুলুম দেখে তিনি চাকরীর পরোয়া না করে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান; পরে আদালতে তাঁর জরিমানা হয়। সেই জুলুমের কাহিনী ও প্রতিবাদ তিনি লেখেন "বেঙ্গল স্পেকটেটরে" (১৮৪৩)। অতি দরিদ্রঘরের সন্তান ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন; দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তিনি নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং নিজেকে স্বশিক্ষিত করে তোলেন। রাজস্ববিভাগে চাকরী পাবার পর (১৮৮১) তিনি *A Rough List of Indian Art-manufactures* (১৮৮২) নামে একটি ছোট বই লেখেন; আমস্টারডামে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে এটি রচিত। এই তালিকাটি এতই উৎকৃষ্ট ও অভিনব যে এটি রচনার ফলে এই ডিগ্রীহীন মানুষটি অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। তারপর তিনি ভারতীয় চারুশিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে কয়েকটি বই লেখেন। তাঁর *Art-Manufactures of India* (১৮৮৮) আজও একটি প্রামাণিক উৎস গ্রন্থ। বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁকে দুবার সরকারী খরচায় বিলেতে পাঠানো হয়। আবার এই ত্রৈলোক্যনাথই 'উড়জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম' প্রচারের উদ্দেশ্যে 'উৎকল শুভকরী' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৮৬৯); আর 'কঙ্কাবতী' ও 'ডমরুচরিত' তো তাঁর কালজয়ী সাহিত্যকীর্তি[৮]।

দরিদ্র দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাদি পড়ে তরুণ বয়সে তিনি যুক্তিবাদী সংস্কারক হয়ে ওঠেন। লোনসিংহ গ্রামে শিক্ষকতা করার সময়েই তিনি 'অবলাবান্ধব' (১৮৬৯) পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। স্ত্রী শিক্ষাবিস্তারে নিবেদিতপ্রাণ এই বিবেকী পুরুষ তাঁর প্রতিভাসম্পন্ন পত্নী কাদম্বিনীকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করেন এবং পরে তাঁকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, ভারতসভার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক দ্বারকানাথ চা-বাগানের কুলিদের দুরবস্থার উদ্ঘাটনে ও কুলি আইন সংশোধনেও

নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন[৯]।

উনিশ-শতক জুড়ে এবং বিশ শতকের প্রথমাংশেও এই ধরনের বহুসংখ্যক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ বাংলার রেনেসাঁসকে অর্থবহ করে। রেনেসাঁস-উত্তর ইয়োরোপের সঙ্গে ইংরেজের সূত্রে যোগসাধন না ঘটলেও বাংলার পরম্পরানির্ভর সমাজ-সংস্কৃতি এই ধরনের আত্ম-নির্মাণে সমর্থ, অনুসন্ধিৎসু, বিবেকী ও বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটাতো—এমন প্রকল্প দেশাভিমানের পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু তার সমর্থনে নির্ভরযোগ্য যুক্তি অথবা তথ্য মেলে না। ইংরেজ যেমন এদেশকে নানাভাবে শোষণ করেছিল তেমনি ইংরেজের মাধ্যমেই নানা নূতন প্রায়োগিক ও ভাবগত উপাদান এদেশে প্রবর্তিত ও বিদিত হয়। সেইসব উপাদান যাঁদের উদ্যোগে আত্তীকৃত তাঁরাই বঙ্গীয় তথা ভারতীয় রেনেসাঁসের নায়ক। মুদ্রণ যন্ত্রের উদ্ভাবন একদিন যেমন ইয়োরোপের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের অন্যতম প্রধান সহায়ক হয়েছিল, এখানেও তেমনি তারি প্রবর্তন নূতন নানা সাংস্কৃতিক সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দেয়। উনিশ-শতক জুড়ে অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশ এবং সেই সূত্রে জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলবৃদ্ধি ও বৈকল্পিক নানা ভাবনাচিন্তার প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের একটি বিশিষ্ট দিক। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্স্ ঘোষণা করে-ছিলেন মানুষ এবং প্রকৃতির সব দিকই তাঁদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। জোন্স-এর এই ঘোষণা পশ্চিমাগত বটে, কিন্তু উনিশ-শতকী বাংলার কিছু ভাবুক এটিকে তাঁদের নিজেদের ঘোষণা করে নিলেন। গড়ে উঠল এই দেশের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসরচনার সাধনীপদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ ও আবিষ্কার এবং সেই তথ্যের সত্যতা নির্ণয় করবার আগ্রহ, উপায় ও সামর্থ্য, ঐতিহ্যকে নির্ভরযোগ্যভাবে বিচার বিশ্লেষণের প্রণালী। ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, শারীরস্থান প্রভৃতির চর্চায় কিছু বাঙালির মন নিযুক্ত হল। তুলনামূলক ধর্ম-বিচারের গোড়াপত্তন করলেন রামমোহন। এল প্রাকৃতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপার্শ্বকে জানবার, বোঝবার কৌতূহল ও অভিনিবেশ, প্রাচীন উত্তরাধিকার ও নবাগত সম্ভাবনাকে বিকাশের উপাদানে রূপান্তরিত করবার ব্যগ্রতা ও অধ্যবসায়, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্যম ও তজ্জনিত সংঘাত। মানবীয় অধিকার চেতনা চিহ্নিত করল নূতন প্রতিন্যাসকে। কিছু

ব্যক্তি সচেতন হতে শুরু করলেন তাঁদের ঐহিক প্রাতিস্বিকতা সম্পর্কে। নারীকে পুত্রার্থে নয় মানুষ হিসেবে মূল্য দেবার দাবি ধ্বনিত হল। গড়ে উঠতে লাগল নানা নূতন ধরনের নাগরিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ; অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অনেকে প্রকাশ্যে অংশ নিতে শুরু করলেন ; দায়িত্বশীল সরকার, প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা, ইত্যাদি অর্বাচীন রাজনৈতিক ধ্যানধারণাও ক্রমে প্রসারলাভ করল। জমিদারী ও জাতপাতের সমালোচনা শোনা যেতে লাগল ; ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক সাম্যের আদর্শের প্রতিও কেউ কেউ আকৃষ্ট হলেন।

উনিশ-শতক জুড়ে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের কিছু অংশের চেতনা অভ্যস্ত জড়তা, কূপমণ্ডুকতা ও পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি পেয়ে একদিকে ব্যাপকতা ও অন্যদিকে তীক্ষ্ণতা ও গতি অর্জন করে। এই ঐতিহাসিক ব্যাপারটির সব চাইতে স্থায়ী ও ফলপ্রদ প্রকাশ ঘটে বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে। এক্ষেত্রে অন্তত দুটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত যাঁরা এক শতকের মধ্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন ও অপ্রতিদ্বন্দ্ব বিকাশ ঘটান তাঁদের সকলেরই ইংরেজী ভাষায় দখল ছিল, এমনকি তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই প্রচুর লিখেছেন। অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী চর্চা তাঁদের মাতৃভাষা চর্চাকে মোটেই ব্যাহত করে নি, উল্টে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধতর করার সামর্থ্যকেই বাড়িয়েছে। যাঁরা যত্ন সহকারে একটির অধিক ভাষা অনুশীলন করেছেন তাঁরা জানেন অপর ভাষার জ্ঞান মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা বিষয়ে বোধকে সূক্ষ্মতর ও তীক্ষ্ণতর করে। ইংরেজী ভাষাও একসময়ে নিতান্ত দরিদ্র ছিল। ফরাসী ও লাতিন ভাষা এবং গ্রীক ও ইতালীয় সাহিত্য থেকে অজস্র উপাদান আহরণ করে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শক্তিশালী হয়। অসামান্য সমৃদ্ধি সত্ত্বেও সে ভাষায় ও সাহিত্যে দায়িত্বশীল অভিযোজনা ও বিবেকী তর্জমার কাজে কোনো ঢিলেমি আসে নি ; পরিমিশ্রণ ও উদ্ভাবনের দ্বারা সে সাহিত্য আজও আপনাকে বিবর্ধিত করে চলেছে। বাংলার দ্বিভাষী (এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহুভাষী) মনস্বীরা অন্য ভাষায় দখল থাকার ফলে সেই ভাষার সাহিত্য থেকে অনেক নূতন জ্ঞান ও ধারণা, রূপ ও রীতি, মূল্যবোধ ও সূক্ষ্মদৃষ্টি অর্জন করে বাংলায় তাদের প্রকটিত করেন। যে মন বাংলা ভাষায় ধৃত ও প্রকাশিত তা এইসব আগন্তুক ও অভিনব উপাদানকে আত্মস্থ করে বাংলা সাহিত্যকে শীর্ণ

সংকুচিত গ্রাম্যতা থেকে বিস্তারশীল, ঊর্ধ্বগ বৈশ্বিকতায় প্রস্থাপিত করে। বিদ্যাসাগর 'চেম্বার্স এক্সেমপ্ল্যারি বাওগ্রাফি' থেকে উপাদান নিয়ে 'জীবনচরিত' রচনায় সঙ্কোচ করেন নি। জ্ঞানের অনুধাবনে তন্মনস্ক, অধ্যবসায়ী, উদ্ভাবক ও মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন যেসব ব্যক্তিকে তিনি স্বদেশীয় পাঠক সমাজের কাছে অনুসরণযোগ্য মহাজন হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন (যেমন কোপার্নিকস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্সেল, গ্রোশিয়াস, লিনিয়াস, উইলিয়ম জোন্স্ প্রভৃতি) তাঁরা সকলেই প্রতীচ্যের মানুষ[১০]। জন কুম্ব্-এর 'কন্স্টিটিউশ্যন অব ম্যান' গ্রন্থের অক্ষয়কুমার কৃত ভাবানুবাদ তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি তরুণ মনে আলোড়ন তুলেছিল।[১১] বহুভাষাবিদ্ মাইকেলের সাহিত্যিক দস্যুতা, পরীক্ষানিরীক্ষা ও আত্তীকরণ বাংলা কবিতার চেহারা ও মেজাজ বদলে দেয়। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীর সূত্রে পশ্চিম থেকে দু'হাতে আহরণ করে সেসব উপাদানকে আপন-আপন প্রতিভার দ্বারা জারিত করেছিলেন। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের গুণগত দারিদ্র্যের সম্ভবত একটি কারণ যাঁরা এখন বাংলাভাষায় লেখেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী অথবা কোনো আধুনিক পশ্চিমী ভাষা বা সাহিত্যের চর্চা করেন না। অপর পক্ষে যাঁরা ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক বিষয়াদির অনুশীলন করেছেন তাঁরা অনেকেই বাংলায় লিখতে অনাগ্রহী। সব বঙ্গদেশীয় স্ত্রী-পুরুষকে ইংরেজী শেখাতে হবে এটি স্পষ্টতই বাস্তববোধবর্জিত দাবি। কিন্তু মানবপ্রজাতির নির্মীয়-মাণ জ্ঞানবিজ্ঞান, ভাবনাচিন্তা যেসব উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের সূত্রে আমরা অর্জন করতে পারি তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ বজায় না রাখলেও (এবং বিবেকী অধ্যবসায়ে তাদের থেকে উপকরণ আত্মসাৎ না করলেও) বাংলার বিকাশ আপনা থেকেই অব্যাহত থাকবে, এটিও নিতান্ত দায়িত্ববিমুখ, অবিবেচক ও অলস প্রত্যাশা।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় ব্যাপারটি হল, বিশ শতকের সূচনা থেকেই রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বাঙালির প্রভাব ক্ষীয়মাণ হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার সমকালীন অর্ধশতাব্দী ধরে বঙ্গীয় মনীষার প্রকাশ প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ও বহুপ্রজ প্রতিভার উপস্থিতিই তার প্রমাণ, এমনকি মুখ্য উৎস নয়। চল্লিশের দশক পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। উপাচার্যরূপে আশুতোষের কৃতিত্ব অসামান্য। তাছাড়া এই শতকের

প্রথমার্ধে চিত্রকলায় অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র, যামিনী রায় (এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ), বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ, ইতিহাসচর্চায় রাখালদাস, যদুনাথ, রমেশচন্দ্র, এবং সাহিত্যে বিশেষ করে তিরিশের দশকের অবিশ্বাস্য প্রাচুর্য—'বিচিত্রা', 'কবিতা', 'পরিচয়', 'চতুরঙ্গ', 'পূর্বাশা' প্রমুখ প্রোজ্জ্বল পত্রিকা, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্র, অমিয়, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দের মতো প্রতিভাবান কবি, অন্নদাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক, প্রেমেন্দ্রের মতো অভিযাত্রী কথা-সাহিত্যিক—এ তো সেই বঙ্গীয় রেনেসাঁসেরই বিস্তীর্ণ বৈভবের প্রদীপ্তি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেশবিভাগের পূর্ববর্তী বিশ বছরকে মোটেই দরিদ্র বলা চলে না। এখানেও কি আমরা ইতালির মতোই দেখি না যে রাষ্ট্রিক-আর্থিক বিস্রংসনের পরিবেশেও মনস্বিতার চর্চা ও প্রকাশ অন্তত কিছুকালের জন্য সম্ভবপর—বিশেষ করে যদি সেই প্রকাশের মাধ্যম অব্যবহিত পূর্ববতীকালে সুসমৃদ্ধ হয়ে থাকে ? ইতালীয় মানসের স্ফুরণ ঘটেছিল মুখ্যত চিত্রকলায়, বাঙালি মানসের মুখ্যত কবিতা ও কথাসাহিত্যে। বঙ্কিম থেকে মানিকে, মাইকেল থেকে জীবনানন্দে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বৈচিত্র্য ও অনবচ্ছিন্ন প্রসার বিস্ময়কর। এবং যদিও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সার্বিক অবসাদ আজ প্রকট, তবুও পূর্ববর্তী সার্ধশতাব্দীর উত্তরাধিকার থেকে শুধু সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ বাংলাদেশের নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যও পুষ্টি ও প্রেরণালাভে না অক্ষম, না অনীহ। ফলত আমাদের সমকালীন নিরালোক নির্বিণ্ণতা পূর্ববর্তী প্রোজ্জ্বল ও উন্মুখ মানসকেই বৈসাদৃশ্যের দ্বারা প্রকটিত করে।

তিন

প্রকটিত করে এবং নানা প্রশ্ন তোলে। কেন, কীভাবে, কার গাফিলতিতে অথবা সক্রিয় বিরুদ্ধতায় বাঙালিদের এই সার্বিক দুর্গতি ঘটেছে ? দেড়শো বছর ধরে যে মানস-উজ্জীবন ঘটেছিল গত তিরিশ বছরে তা কী করে প্রায় পুরাকাহিনীতে পর্যবসিত ? এ জাতীয় আর্ত প্রশ্নের একটি উপশমক উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য। অসামান্য সম্পদের উত্তরাধিকারও ক্রমাগত প্রতিকূল অবস্থার চাপে অবসিত হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রায় সমতুল্য ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চল্লিশের দশকে আমাদের যৌবনকালে অবিভক্ত বাংলায় ঘটে। মহাযুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি,

কালোবাজার, উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, দেশবিভাগ, লক্ষ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষের উৎপাটন ও অনৈচ্ছিক সহায় সম্বলহীন অভিবাসন—এক দশকের মধ্যে একটির পর একটি প্রচণ্ড ও ব্যাপক আঘাত বঙ্গদেশকে বিপর্যস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। তারপর পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে দুই বাংলাতেই প্রাক্‌চিন্তাহীন, অপ্রতিবন্ধ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক খুনোখুনীর বামাবর্ত ও সংগঠিত গুণ্ডামির সর্বদলীয় পৃষ্ঠপোষণা, পূর্ব বাংলায় পাঞ্জাবি স্বৈরতন্ত্র, রক্তাক্ত স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পরিকল্পিতভাবে নিধনপর্ব, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নেতৃত্বের উদ্বায়ী, আন্তত্রিকতাশ্রয়ী বাস্তববোধবর্জিত ক্রিয়াকলাপ—এসবই তো রেনেসাঁসী সাধনার প্রতিসারী। এদের দ্বারাই তো সমকালীন উভয় বাংলার বিপর্যাস ব্যাখ্যা করা যায়।

যায় বটে, কিন্তু সে ব্যাখ্যাকে যথার্থ নিদাননির্ণয় হিসেবে গ্রহণ করতে বাধে। যে ভয়ংকর ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছি, যেসব ঘটনা আমাদের অনেকের কাছেই পরোক্ষ তথ্য মাত্র নয়, আসলে সেগুলি কি বিপর্যয়ের কারণ অথবা রোগের নানা লক্ষণ? বিপর্যয়-প্রকটিত ব্যাধিটি কি অনেক বেশি জটিল ও প্রাচীন নয়? বাংলার সমকালীন অভিগ্রস্ত অবস্থার জন্য ভূপ্রকৃতিকে নিশ্চয় দায়ী করা চলে না। এই-সব মারণযজ্ঞের বলি যেমন অগণিত মানুষ, এদের হোতা ও যজ্ঞাংশভুক উপদেবতারাও তেমনি মানুষ। তাদের দায়িত্বের প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা জরুরী। সেটি ঠিক মতো বুঝতে পারলে হয়তো-বা এই নির্বিঘ্ন, নিরাশ্বাস অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায়ও দৃষ্টিগোচর হতে পারে। যে উদ্দীপ্ত রেনেসাঁসের সঙ্গে সাম্প্রতিক ধূমিত নৈরাশ্যের বিসদৃশতা এত ব্যক্ত তার ভিতরেই কি অবক্ষয়ের প্রধান সূত্রগুলি নিহিত? অথবা সেই সূত্রদের জট আরও দূরপ্রসারী, আরো গভীরে স্থাপিত?

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে সম্প্রতিকালে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। উক্ত ব্যাপারটি ঘটে ইংরেজশাসনকালে, শাসনসূত্রে আগত উদ্দীপকসমূহের সহায়তায়, এবং উপনিবেশতন্ত্রে শাসিতজনের বিকাশ-সম্ভাবনা যে অতি অল্প একথা সাধারণস্বীকৃত। পলাশির পর থেকে ইংরেজরা এদেশের বিস্তর ধনসম্পদ নানাভাবে লুঠ করে নিয়ে যায়; তাদের স্বপক্ষপাতী আইনকানুন এবং শিল্প-বিপ্লবের চাপে বাংলার বিখ্যাত বস্ত্রশিল্প লোপ পায়; এখানকার

আর্থিক ব্যবস্থা একদিকে বিদেশে কাঁচামাল সরবরাহের উৎসে আর অন্যদিকে বিদেশে প্রস্তুত পণ্য বিক্রয়ের বাজারে পর্যবসিত হয়। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় এদেশী বণিক ব্যবসায়ীদের স্বাধীন উদ্যোগ ও সম্প্রসারণের সুযোগসুবিধা দ্রুত হ্রাস পায়। গোড়ার দিকে এদেশী দোভাষ, দালাল, পাইকার, মহাজনেরা কোম্পানির সেবা করে এবং অল্প কিছু বণিক ব্যবসায়ী ইংরেজদের সহযোগিতা করে বেশ ফুলে ফেঁপে ওঠে বটে, কিন্তু তাদের টাকা মুখ্যত নিযুক্ত হয় জমি কেনায় এবং ব্যয়িত হয় বেহিসেবী ব্যসনে-উৎসবে, আচার-অনুষ্ঠানে। স্বাধীন ব্যবসাবাণিজ্যের খুব কম সুযোগ এবং তাতে বিস্তর ঝুঁকি-ঝামেলা দেখে তাদের সন্তানরা তথা পরবর্তীকালের ইংরেজী শিক্ষিতরা সরকারী ও বে-সরকারী চাকরী ও বিভিন্ন সমাজ-সম্মানিত পেশা অবলম্বন করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্বের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হয়, কিন্তু চাষীদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। বন্দোবস্তের প্রশ্রয়ে জমিদাররা জমির প্রতি দায়িত্ববোধহীন হয়ে ওঠে, স্তরে স্তরে বিস্তর মধ্যস্বত্ব পরগাছা গজায়, কৃষিতে উন্নতি সাধনের কোনো শক্তি আর গ্রামে বর্তমান থাকে না। উনিশ-শতকে বাংলার শহরে মফস্বলে যে বাবু বা ভদ্রলোকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠালাভ করে, দরিদ্র, সুযোগ-ও-শিক্ষাবঞ্চিত গ্রামবাসীদের প্রতি তাদের কোনো দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে না। জন্মসূত্রে এদের অধিকাংশ পরম্পরানির্ভর হিন্দু সমাজের 'উঁচুজাতের সন্তান,' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্য। অন্য কোন কোন জাতের (যেমন সুবর্ণবণিক, নবশাক ইত্যাদি) কিছু লোক বিদেশী শাসন ও ইংরেজী শিক্ষার সুযোগে নিজেদের অবস্থার খানিকটা উন্নতি ঘটালেও, শিক্ষা, চাকরী, সমাজসম্মানিত পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উঁচু তিন জাতের প্রাধান্য শুধু বজায় থাকে না, আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই এই উঁচু জাতের লোকেরা রক্ষণশীল, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে রফা করে চলার অনুশীলনই তাঁদের স্বধর্ম। তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সংস্কারে উদ্যোগী তাঁরাও অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত, এবং তাঁদের অনির্ভরযোগ্য সমর্থকেরা সমাজে নিতান্তই উনজন। বাংলার অর্ধেক অধিবাসী মুসলমান ; তাঁদের অধিকাংশই দরিদ্র, নিরক্ষর চাষী। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা আশরফ বা নেতৃস্থানীয় উনিশ-শতকের প্রধান অংশ ধরে তাঁরা ইংরেজী শিক্ষায় অনীহ, বাংলা চর্চায় বীতরাগ, নিজেদের সমাজ সংস্কৃতির সংস্কারে ও উন্নতি সাধনে উদাসীন[১২]। বিশ শতকের গোড়া

থেকে ধীরে ধীরে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার কিছুটা প্রসার ঘটে, আর ইংরেজ শাসকরা নানাভাবে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদবুদ্ধিকে উস্কে দিতে থাকে। চাকরী, পেশা, বিভিন্ন সরকারী আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি ব্যাপারে আশরফ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান যতই হিন্দুর কায়েমী আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নিজেদের অংশ দাবি করেন ততই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ প্রকটিত হয় এবং সেই বিরোধকে প্রবলতর করে তোলে ইংরেজের কূটনীতি। শেষ পর্যন্ত তার ফল দেশবিভাগ। তাই অনেকের মতে ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রে যে রেনেসাঁসের সংঘটন তা আগাগোড়াই ব্যাধিত ও ক্ষীণপ্রাণ। কারণ উপনিবেশতন্ত্র উপনিবেশের স্থানীয় অধিবাসীদের কোনোবিধ বিকাশেরই সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

এই বহু প্রচলিত ও জনপ্রিয় ব্যাখ্যার অনেকটাই তথ্য এবং যুক্তি সমর্থিত, কিন্তু এটিতে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কৃতির স্বীকার নেই, এবং প্রাসঙ্গিক বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর মেলে না। সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই শিল্পসাহিত্যের রসে বঞ্চিত 'গোবিন্দদাস'। উপাদান-উপকরণ নিয়েই তাঁদের কারবার; মানুষের ভিতরে অস্মিতার বা অনন্যতার উপস্থিতি তাঁদের লঘুকারণিক প্রবণতাকে বিব্রত করে; সৃজননির্ভর শিল্পসাহিত্যের কালজয়ী মূল্য তাঁরা বোঝেন না অথবা বুঝতে চান না। উপনিবেশতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত বঙ্গীয় রেনেসাঁস যদি আগাগোড়াই ব্যাধিত ও বন্ধ্যা হয়ে থাকে তাহলে মাইকেল-বঙ্কিম থেকে মানিক-জীবনানন্দ এবং মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ কি মায়া না মতিভ্রম? বহুবেধ, বহুবাচনিক ও বিকল্পবিহারী মানব-ইতিহাসে যেসব কূট, সমস্যাকীর্ণ, সম্পন্ন সম্ভাবনা বিদ্যমান—যেমন, রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক ইতিহাসের পাশাপাশি বৌদ্ধিক-শৈল্পিক ইতিহাসের নিজস্ব ধারা বয়ে যায়, এইসব ধারার ভিতরে সম্পর্ক থাকলেও সর্বক্ষেত্রে এদের কোনো একটি অন্য আরেকটির আবশ্যিক বা কারণিক নির্ধারক নয়, একটির স্ফূর্তি অন্য আরেকটির সমকালীন বা সমতুল্য স্ফূর্তির দ্বারা সমর্থিত নাও হতে পারে, কোনো সমাজে বিশেষ সামর্থ্য ও প্রবণতা সম্পন্ন কিছু সংখ্যক ব্যক্তির বিশেষ উদ্যোগের সূত্রে সেই সমাজের বিশেষ বিশেষ দিকের লক্ষণীয় বিকাশ সম্ভবপর—পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় এইসব সম্ভাবনার চেতনা অনুপস্থিত। আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে

উপনিবেশতন্ত্রের বিকাশ-বিরোধিতা সত্ত্বেও পাঞ্জাবে কীভাবে কৃষির লক্ষণীয় উন্নতি সাধিত হয়, অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় পার্শীদের বৈষয়িক-সাংগঠনিক সাফল্যের কারণ কী, ভারতের পশ্চিম উপকূলে বণিক-ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের অভ্যুত্থান কোন কোন অনুকূল শক্তির সমাবেশের ফল, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরে বিভক্ত দুই বাংলাতেই অবাঙালিদের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যের সংগত ব্যাখ্যা কি হতে পারে। শুধুমাত্র উপনিবেশতন্ত্রের সার্বিক ক্ষতিকরতার সূত্র আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসকে বোঝবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। বস্তুত একদিকে যেমন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কৃতির সঙ্গে ইংরেজ শাসনের সূত্রে আগত এবং ইংরেজী ভাষাধৃত উদ্দীপকসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনস্বীকার্য, অন্যদিকে তেমনি সেই রেনেসাঁসের অসম্পূর্ণতা এবং তার উত্তরাধিকারের সমকালীন অবক্ষয়ের সঙ্গে পরম্পরাশ্রয়ী বঙ্গীয় সমাজসংস্কৃতির সম্পর্কও বিচারণীয়।

হিন্দু জাতিপংক্তির স্থায়ী অসাম্যভিত্তিক ও উদ্যোগবিরোধী প্রতিন্যাস এবং তারি সমর্থক ধ্যানধারণা সেন আমলেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় কিনা বলা শক্ত, তবে পাঠান মোগল আমলেও দেখা যায় যে কী মুসলমান কী হিন্দু সমাজসংস্কৃতিতে ব্যবসায়ী-প্রাযুক্তিক-কারিগর ব্যক্তিরা বিশেষ সম্মানার্হ, গুণসম্পন্ন অথবা অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হন নি। সাধারণভাবে সমাজে প্রাধান্য পেয়েছেন রাজপুরুষ ও জমিদার ; বিশেষ করে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা যাঁদের মধ্যে অনেকেই জমিদার অথবা রাজকর্মে নিযুক্ত। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের, প্রযুক্তি-উদ্ভাবনার, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের এবং উদ্বৃত্তবর্ধনের জন্য এক বিশেষ ধরনের ভাবনাচিন্তা, মূল্যনিচয়, প্রতিন্যাস-আচরণ, সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্ক-সংগঠন জরুরী। বৌদ্ধিক-শৈল্পিক রেনেসাঁসের এগুলি পূর্বশর্ত নয়, কিন্তু সেই রেনেসাঁসের প্রভাব সমাজজীবনে পবিব্যাপ্ত করার জন্য এগুলির উন্মেষ ও বিবর্ধন আবশ্যক। রেনেসাঁসের কালে এমনকি তার পরবর্তী তিন শতকেও ইতালিতে পুঁজিবাদী শ্রেণী ও সংস্কৃতির আত্মনির্ভরক্ষম ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটে নি। ইতালীয় রেনেসাঁসের শৈল্পিক কৃতির স্থায়ী মূল্য সত্ত্বেও আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক রূপান্তর সেখানে দীর্ঘকাল অবহেলিত ও অনারব্ধ। উপরন্তু রেনেসাঁসের বৌদ্ধিক প্রভাবের বিরোধিতা করে সেখানে

ক্যাথলিক চার্চ আবার নিজের শক্তিকে প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ব্রিটেনে, হল্যাণ্ডে এবং কিছুটা পরে ফ্রান্সে রেনেসাঁসী উদ্দীপক বিকাশশীল ধনতন্ত্র ও উদারতন্ত্রের সমর্থনে সমাজ-সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। বাংলার সঙ্গে এক্ষেত্রে ইতালির কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ইংরেজ শাসনের পূর্বে বাংলায় বণিক ব্যবসায়ী কারিগর থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী ভাবনাচিন্তা, প্রতিন্যাস-প্রতিষ্ঠান প্রাধান্য লাভ করে নি। এদেশে কেনা মালের দাম দেবার জন্য পশ্চিমী বণিকদের আপন-আপন দেশ থেকে বিস্তর সোনারূপোর বাট আমদানি করতে হয়েছে। কিন্তু বহিরাগত সেই সোনারূপো যে এদেশী পণ্য বিক্রেতারা উৎপাদন পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার উন্নতিতে অথবা ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্ফারণে বিনিয়োগ করেছিলেন তার প্রমাণ দুর্লভ। ইংরেজ শাসনকালেও ভদ্রলোক ও আশরফরা পুঁজিবাদী জীবনচর্যাকে তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসে-আচরণে অথবা সমাজ-সংস্কৃতিতে কেন্দ্রীয় স্থান দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। এমনকি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অস্মিতাসম্পন্ন পুরুষরাও এক্ষেত্রে ক্বচিৎ উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁদের শক্তি ভাষা-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যতটা নিয়োজিত হয়েছে, ব্যবসাবাণিজ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তার তুলনায় অতি অল্প অংশই নিযুক্ত হয়েছে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো ব্যতিক্রম বিচিত্রোদ্যোগ প্রতিভাও শেষ পর্যন্ত জমিদারী মনোভাব ও আচার-আচরণ ছাড়তে পারেন নি। এবং তাঁর বংশধরেরা তিনপুরুষ ধরে তাঁর জমিদারীর উপস্বত্ব অকুণ্ঠিত চিত্তে ভোগ করেছেন, কিন্তু তাঁর অসামান্য ব্যবসায়িক কৃতি উক্ত উত্তরপুরুষদের দ্বারা সচেতন-ভাবেই অবহেলিত[১৩]।

কোনো সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যেসব চারিত্রিকের উন্মেষ ও সযত্ন অনুশীলন সে সমাজের আর্থিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ও বিকাশের জন্য আবশ্যিক—যেমন বিলাসঅপচয় প্রবণতাকে পরিহার করে সঞ্চয়ের উপরে ঝোঁক, সম্পদবৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়ের সুপরিকল্পিত বিনিয়োগ, সামাজিক-প্রাকৃতিক পরিবেশকে অপরিবর্তনীয় বলে মেনে না নিয়ে নিজের উদ্যোগে তার প্রয়োজনীয় সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণের আত্মপ্রত্যয়, প্রযুক্তি উদ্ভাবনের আগ্রহ এবং উদ্‌ভাবনাকে কাজে লাগাবার সংগঠনসামর্থ্য ও ব্যবহারিক বুদ্ধি, সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দূরস্থিত দেশবিদেশের অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের প্রচেষ্টা, সময়নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়, নাগরিক অধিকারবোধ এবং অধিকারের

প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য অবিচ্ছিন্ন ও সহযোগী প্রয়াস, ইত্যাদি— সেগুলি ইংরেজ শাসন পূর্ববর্তী বাঙালি সমাজনেতাদের মধ্যে দুর্লভ এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলিই ইংরেজ শাসনকালে বাঙালি সমাজ-পতিদের মধ্যেও গড়ে ওঠে নি। ভদ্রলোক অথবা আশরফ কোনো পক্ষই এইসব চারিত্রিককে মূল্য দেন নি। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উদ্যোগী ভাবুকদের মধ্যে এইসব চারিত্রিকদের কোন কোনটি লক্ষিত হলেও সমগ্রভাবে ব্যবসাবাণিজ্য সঞ্চয় ও প্রযুক্তির সম্বর্ধক সূত্রগুলি তাঁদেরও ভাবনাচিন্তায়, সাহিত্যিক প্রকাশে ও সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টায়, ব্যক্তিগত জীবনে অথবা পারস্পরিক সম্পর্কে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে নি। ইতালীয় রেনেসাঁসের পরে সতেরো-আঠারো শতক ধরে পশ্চিম ইয়োরোপে যে বুর্জোয়া রূপান্তর সাধিত হয়, বাংলার ইতিহাসে সেটি এখনো অসম্পাদিত। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বৌদ্ধিক-শৈল্পিক উৎকর্ষকে মূল্য দেবার পরও স্বীকার করা সংগত যে এখানকার সমাজজীবনে প্রাগৌপনিবেশিক কালের পরম্পরাশ্রয়ী, উদ্যোগ-উদ্ভাবনবিমুখ, ব্যবসাবাণিজ্য-প্রযুক্তিতে অনাগ্রহী, ব্যয়াতিশয্য-প্রবণ, সময়নিষ্ঠাহীন, ভাগ্যনির্ভর প্রতিন্যাস ও আচরণ প্রবল থেকে গেছে। সংকটকালে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণের অসামর্থ্য এই প্রতিন্যাসের ফল। এই মনোভাবটি আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে শিক্ষা অথবা অনুকরণের সূত্রে পাই নি। এটি আমাদের নিজস্ব সযত্ন-লালিত উত্তরাধিকার ঔপনিবেশিক অভিভাবকত্বের প্রশ্রয়ে যেটি সম্ভবত আরো দূরাক্রম্য হয়ে উঠেছে। যে অবসাদে সম্প্রতি বাঙালি-দের জীবন আচ্ছন্ন তার অন্তত একটি সূত্র ইংরেজপূর্ব বঙ্গীয়মানসে নিহিত, এবং সচেতন অধ্যবসায়ে এটিকে উচ্ছিন্ন না করতে পারলে বাঙালিদের বর্তমান দুঃসহ এবং ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বৌদ্ধিক-সাহিত্যিক কৃতি বিশেষ সম্মানার্হ, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ত্রুটি ছিল বই কি। বিস্মৃত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পুনরাবিষ্কার, মূল্যায়ন ও প্রয়োজন-অনুসারে স্বীকরণ করতে গিয়ে বঙ্গীয় ভাবুকরা সেই উত্তরাধিকারের কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিকের প্রতি সাধারণভাবে অনাগ্রহী থেকে যান। বিভিন্ন উপনিষদ ও ধর্ম-শাস্ত্র এবং পরের দিকে গীতাকে তাঁরা অত্যধিক মূল্য দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু বৈশেষিক, চার্বাক ও অন্যান্য জড়বাদী চিন্তাধারা, বৌদ্ধদর্শন ও নব্যন্যায়, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবদেহ সম্পর্কে অতীতকালের

নানাবিধ তথ্য, পরীক্ষা ও বিনয়নির্ভর অনুসন্ধান তাঁদের দ্বারা অনেকটাই অবহেলিত। অথচ এই দিকগুলির চর্চা উনিশ-শতকী বাংলায় যুক্তিশীলতার বিকাশে সহায়ক হতে পারত। ভারতীয় উত্তরাধিকারের একটি প্রধান ধারা ইসলামের সূত্রে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত প্রবাহিত। এই ধারাটিতে ধর্ম-বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধ যতই প্রাধান্য পাক এটি একদা দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিকিৎসাবিদ্যার সম্পদে সমৃদ্ধ ও বলশালী ছিল। কিন্তু শিক্ষা-সুযোগহীন অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় ঘটে নি। মুল্লা, মৌলবী এবং আশরফজন এই ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না ; এবং যেসব হিন্দু ভাবুক বঙ্গীয় রেনেসাঁসে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁরাও আরব-সভ্যতার উত্তরাধিকার বিষয়ে অবহিত হন নি। অবশ্য রেনেসাঁসের আদিপুরুষ রামমোহন সংস্কৃতের সঙ্গে সমান অভিনিবেশে আরবী ও ফারসীর চর্চা করেছিলেন। এই চর্চা যে তাঁর মনের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল 'তুহ্ফাৎ' তার প্রোজ্জ্বল প্রমাণ। কিন্তু উপনিষদের ব্যাখ্যা ও অনুবাদে ব্যাপৃত হবার পর আরব ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা সম্ভবত হ্রাস পায়। 'মীরাত-উল আখবার' ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত বটে, কিন্তু আরব সভ্যতার যে জিজ্ঞাসু প্রাণশক্তি একসময়ে ইয়োরোপেও উদ্দীপকের ভূমিকা নিয়েছিল, স্বয়ং রামমোহনের রচনাবলী থেকেও সেই সভ্যতার বিশেষ পরিচয় মেলে না। বাংলার রেনেসাঁস এই উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ অথবা উদাসীন। গিরীশচন্দ্র সেন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, কিন্তু তাঁর আগ্রহও কোরাণ ও ইসলামধর্মশাস্ত্রে সীমাবদ্ধ। ইসলামের বিচিত্র সাংস্কৃতিক কীর্তির পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন আমীর আলী তাঁর রচিত 'সারাসেনদের ইতিহাস' গ্রন্থে (১৮৯৯)। কিন্তু আমীর আলীর এই বইটি এবং অন্য রচনাদি ইংরেজীতে লেখা ; তিনি নিজেকে আদৌ বাঙালি মনে করতেন না ; জীবনের দীর্ঘ শেষাংশ তিনি বিলেতে কাটান। তাঁর উদারনৈতিক এবং বিচারপ্রবণ ইসলামব্যাখ্যা হিন্দু বা মুসলমান কারও উপরেই লক্ষণীয় প্রভাব ফেলে নি। আরব সাংস্কৃতির সঙ্গে অপরিচয়ের ফলে বাংলার রেনেসাঁস নিজেকে বঞ্চিত করেছে'[১৪]। এই অজ্ঞতা ও অবহেলার সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের প্রতি বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুর তাচ্ছিল্যের মনোভাব এবং বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানের হীনমন্যতার

বিশেষ সম্পর্ক আছে। মুল্লা-ব্যাখ্যাত ধর্মীয় বিধিনিষেধ আর অলৌকিক নানা উপাখ্যানকে বাঙালি মন ইসলামের সঙ্গে সমীকৃত করেছে। আর-রাজি, আল-আরাবি, ইবন্ সিনা, ইবন্ খালদুন, ইবন্ রুশ্‌দ্, আল রাজেন, হুনেন ইত্যাদির দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রচনাদি নিয়ে বাংলাভাষায় বিস্তারিত আলোচনা হলে ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ে বঙ্গীয় মানসের হয়তো বা অর্থবহ পরিবর্তন ঘটতো। বিশ শতকের সূচনায় বেগম রোকেয়ার অসামান্য প্রবন্ধাবলীতে এবং পরবর্তীকালে 'শিখা' ও 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনে যে রেনেসাঁসী মনস্বিতার প্রতিশ্রুতি আভাসিত পূর্বোক্ত চিন্তকদের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় থাকলে তা হয়তো শিক্ষিত হিন্দুদের দ্বারা অবহেলিত এবং গোঁড়া মুসলমানদের দ্বারা দমিত নাও হতে পারত[১৫]।

পশ্চিমী রেনেসাঁসের সময়েও বিশুদ্ধ জড়বাদী, যুক্তিবাদী বা নাস্তিক মানবতন্ত্রী ভাবুকের সংখ্যা কম। কিন্তু সেই কালেই জ্ঞানের চর্চাকে, শিল্প-সাহিত্যকে, নৈতিকতাকে, আর্থিক-রাষ্ট্রিক-উদ্যোগ-সংগঠন প্রভৃতিকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠানের প্রবল প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করবার চেষ্টা সুস্পষ্ট হয়। পশ্চিমে রেনেসাঁস-উদ্ভূত এই নূতন ভাবাদর্শের নাম সেকিউলারিজম্ বা অনাধ্যাত্মিক, ধর্মীয় শাসনমুক্ত, ইহকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষা ও জীবনচর্যার আদর্শ। প্রচলিত ধ্যানধারণার নির্মম মূল্যায়ন ও সমালোচনা, প্রকৃতি ও মানব-ইতিহাসের ধর্মীয় ব্যাখ্যাদির প্রমাণোর্ধ প্রাধিকারকে অস্বীকার, যুক্তিকে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে স্থাপন, আরোহী বিচারপ্রণালীর বিকাশ, নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য অমিত আগ্রহ এবং সংগ্রহের পদ্ধতি, প্রণালী ও সাধনীর উদ্ভাবন, প্রকল্পমাত্রকেই নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করে নেবার প্রতিন্যাস, কোনো ধারণা বা সিদ্ধান্তকেই চরম বা অপ্রতর্ক্য বলে না মেনে নিরন্তর স্বাধীন জিজ্ঞাসাকে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা, ফলে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্মেষ ও সম্বর্ধন—এসবের সূচনা পশ্চিমী রেনেসাঁসে, যদিও এদের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটে পশ্চিম ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে সতেরো এবং আঠারো শতকে অভিজ্ঞতানির্ভর আরোহীবিচার ও যুক্তিনির্ভর আলোকায়নের যুগে। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান বৌদ্ধিক ত্রুটি হল তার প্রবক্তারা প্রায় কেউই ধর্মীয় এবং শাস্ত্রীয় প্রাধিকার থেকে দর্শনজিজ্ঞাসা ও নৈতিকতাকে সুস্পষ্টভাবে মুক্ত করার প্রয়াস পান নি। রামমোহন তাঁর শিক্ষাবিষয়ক পত্রে যে

বেকনীয় ভাববিপ্লবের উল্লেখ করেছিলেন তাঁর নিজের পরিণত চিন্তায় ও রচনায় উপনিষদকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার ফলে সেটিকে তিনি নিজে যথার্থভাবে।সুচিত করতে পারেন নি। ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে কোথায় সেই মনস্বীবৃন্দ যুক্তিবাদী লোকায়ত দর্শনের প্রবক্তা-রূপে যাঁরা ভালা, পম্পনাৎজি, জাবারেলা প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয়[১৩] ? অক্ষয়কুমারের ভিতরে হয়তো বা সে প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু দেবেন্দ্র-নাথের প্রতিকূলতার ফলেই হোক অথবা দুরারোগ্য শিরোরোগের আক্রমণের কারণেই হোক এই সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটে নি। যে বিদ্যাসাগর ব্যাল্যাণ্টাইন ব্যাখ্যাত 'সত্যের দ্বিবিধ রূপ' তত্ত্বের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন তিনিই বিধবাবিবাহ প্রচলনের সমর্থনে শুধু যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও বিবেকের উপরে নির্ভর না করে শাস্ত্রীয় প্রাধিকারমূলক বিচার-প্রণালীর অবলম্বী। অসামান্য মনীষী বঙ্কিমের কাছে গীতার প্রাধিকার অপ্রতর্ক্য। এবং রবীন্দ্রনাথ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে তুরীয়ের লীলা কল্পনা করেছেন তাঁর কবিতায় ও গানে সে কল্পনা আশ্চর্য ফসল ফলিয়ে থাকলেও তা বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও মনোভাব বিকাশের নিতান্ত অনুপযোগী।

বস্তুত বঙ্গীয় রেনেসাঁসে ধর্মবিশ্বাসের অনুষঙ্গ থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, ব্যক্তিগত বিবেক ও রাষ্ট্রিক-আর্থিক ভাবনাচিন্তার স্বতন্ত্রী-করণ প্রায় অনারব্ধ। ইয়োরোপে রেনেসাঁসের সূত্রে সূচিত বৌদ্ধিক রূপান্তরকে সতেরো-আঠারো শতকে যাঁরা ব্যাপক প্রতিষ্ঠা দেন তাঁদের সঙ্গে তুলনীয় চিন্তকরা এ তাবৎ বাংলা ভাষায় দেখা দেন নি। বিশ শতকের শেষ পাদে বাস করছি, কিন্তু বাংলা ভাষায় না খোঁজ মিলছে লক বা হিউম-জাতীয় দার্শনিকের, না কোনো বেইল, ভল্‌তেয়ার, কঁদরসে-র। মৌল মানবতন্ত্রী মানবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় লেখেন নি, তাঁর ইংরেজী রচনাবলীও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের যেটি প্রধান ও স্থায়ী কৃতি সেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশেও এই মৌলিক ত্রুটি প্রতিফলিত। কবিতায় ও কথাসাহিত্যে বাংলার ঋদ্ধির পাশেই প্রবন্ধ-সাহিত্যের দারিদ্র্য বড়ো প্রকট। যাকে বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য বলা হয়ে থাকে তার বেশিটাই রম্যরচনা অথবা জিজ্ঞাসাবিহীন টীকাভাষ্য। এই বৌদ্ধিক দুর্বলতার সব চাইতে মারাত্মক দিকটি ধরা পড়ে যখন রাজনীতির সূত্রে ব্যাপক বিক্ষোভ বিশ শতকের প্রথম ভাগে প্রবল হয়ে ওঠে। সেই বিবর্ধমান

বিক্ষোভকে যুক্তি, বাস্তববোধ ও দায়িত্বজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাবনমুখী সংগঠনের দিকে চালিত করবার সামর্থ্য বাংলার বুদ্ধিজীবী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অর্জন করেন নি। বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা ও চিন্তা-পদ্ধতি চর্চার ভিতর দিয়ে বিবিধ মানবিক সমস্যা সমাধানের উপযোগী যে ধরনের শক্তিসামর্থ্য গড়ে ওঠে বাঙালি ভাবুক ও নেতাদের মধ্যে তার অপ্রতুলতা এখানকার রাজনীতিকে গড্ডলিকাপ্রবাহী এবং উচ্ছ্বাসনির্ভর করে। একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রযুক্তির সম্বর্ধক ভাবনাচিন্তা ও আচরণ-সংগঠনের অভাব, অন্যদিকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত, বস্তুনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক প্রতিন্যাসের অপ্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে ধর্মোন্মাদনাপুষ্ট জাতিবাদের অভ্যুত্থান ও প্রসারকে সহজতর করে, গণবিক্ষোভ ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যাবর্তিত সমাহার ঘটায়, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকে দলগত জিগিরের কাছে বলি দেয়।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তারা সর্বার্থসাধক অথবা বিপ্লবী ছিলেন না। ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও অস্মিতাসম্পন্ন এই মানুষরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে সম্পন্নতা ও সম্ভাবনা আনেন তার জন্য তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁদের উত্তরাধিকারের সুপ্রয়োগ করে, তাঁদের ত্রুটি বিমোচনে প্রয়াসী হয়ে, বৈজ্ঞানিকতা, সমাজের বিকাশে ব্যক্তির দায়িত্ববোধ, ও প্রাযুক্তিক উদ্ভাবনাকে শিক্ষাসংস্কৃতির কর্মসূচিতে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নূতন ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি। কোনো রেনেসাঁসই উদ্‌ভ্রান্তজনকে প্রবোধ দেয় না ; সিসৃক্ষার যথার্থ প্রেরণা এবং প্রকাশই রেনেসাঁস।

টীকা, উল্লেখপঞ্জি ও পুনশ্চ

নাস্তিকের ধর্মজিজ্ঞাসা

১। বুদ্ধপ্রসঙ্গে একটি চমৎকার কাহিনী আছে যেটি বুদ্ধের প্রতি আমাদের যেমন শ্রদ্ধান্বিত করে তেমনি তাঁর শিষ্যদের আভিমুখ্যের উপরেও আলোকপাত করে। সারিপুত্ত একদিন বুদ্ধের কাছে এসে বললেন, প্রভু, অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে এমন কোন জ্ঞানী জন্মান নি বা জন্মাবেন না যিনি আপনার চাইতেও জ্ঞানী। বুদ্ধ শুনে স্মিতহাস্যে বললেন, সারিপুত্ত, তুমি নিশ্চয়ই অতীতের যত মহাজ্ঞানী ছিলেন তাঁদের জেনেছ এবং তাঁদের জ্ঞানের সারমর্ম অনুধাবন করেছ। সারিপুত্ত বললেন, না প্রভু। তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের সমস্ত মহাজ্ঞানীদের জেনেছ এবং তাঁদের জ্ঞানকে তোমার মন দিয়ে গ্রহণ করেছ। না প্রভু। তাহলে অন্তত আমি যেটুকু জেনেছি তার সবটাই জেনেছ। না প্রভু, তাও পারি নি। তবেই দেখ সারিপুত্ত, তুমি অতীতের অথবা বর্তমানের জ্ঞানীদের কথা জান না। তাহলে কেন তুমি এই সোৎসাহ সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হয়েছ ? (T. W. R. Davids, *Dialogues of the Buddha*, iii, 87)

মৃত্যুর পূর্বে বুদ্ধ তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলেন, যারা নিজেদের কাছে নিজেরাই প্রদীপ হয়ে উঠবে, বাইরের কোন কিছুর উপরে নির্ভর না করে নিজের নিজের দীপশিখার আলোকেই নিজেদের জীবন পরিচালিত করবে, আমার জীবদ্দশায়ই বা কি, আমার মৃত্যুর পরেই বা কি, তারাই তো চরম শিখরে উঠবে। (ঐ, ১৫৩)।

সম্ভবত বুদ্ধ নিজে কোন নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চান নি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই ধনী বণিকদের পৃষ্ঠপোষণায় সংঘ বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করে। তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পরেই তাঁর ভক্তদের মধ্যে থেরবাদী এবং মহাসংঘিকদের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। তারপরে অশোকের সমর্থনপুষ্ট সংঘ থেরবাদের সমালোচক বৌদ্ধদের বিতাড়িত করে। সম্রাটের পৃষ্ঠপোষণায় দেশময় স্তূপ, চৈত্য, বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়; স্তূপ পূজা এবং বুদ্ধের নানা প্রতীক পূজা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। আগে থেকেই বুদ্ধ-পূর্ববর্তী পঞ্চবিংশ বুদ্ধের কল্পনা থেরবাদীদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছিল। মহাযানী বৌদ্ধরা বুদ্ধকে দেবতা বানায়, অসংখ্য বোধিসত্ত্ব উদ্ভাবন করে, বিভিন্ন দেবদেবীকে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে। তা না হলে হয়তো এদেশে বৌদ্ধধর্মের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী প্রবল জনপ্রিয়তা সম্ভব হ'ত না। বুদ্ধ যখন শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুর নবম অবতারে পর্যবসিত হলেন, তখন বোঝা গেল বুদ্ধের স্বকীয়তা এদেশ থেকে লোপ পেয়েছে। বৃথাই তিনি

সারিপুত্তকে সাবধান করেছিলেন। হিন্দুধর্মের সর্বগ্রাসী পাচকরস বৌদ্ধধর্মকে জারণ করে অবশিষ্ট বৌদ্ধদের একটি নগণ্য সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু সমাজের এককোণে রেখে দেয়।

২। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুয়ানী এদেশে দৃঢ় এবং ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পাবার আগে ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে কেউ কেউ নাস্তিক ও জড়বাদী ছিলেন। পরবর্তী ধর্মধ্বজীদের প্রবল বিদ্বিষ্ট হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও তার কিছুটা আভাস রয়ে গেছে। বৃহস্পতির মতে স্বর্গ, পরলোক, আত্মা, মোক্ষ, চতুর্বর্ণ এসবই অসত্য; কিছু ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের জন্য বেদ এবং যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি উদ্ভাবন করেছে (M. Monier Williams : *Indian Wisdom* 1893, 120-22)। বুদ্ধের সমসাময়িক অজিত কেশকম্বলিন সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, মানুষ ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুতের সমাবেশ মাত্র, মৃত্যুতে এই সমাবেশ ভেঙে গিয়ে প্রতিটি উপাদান আপন-আপন ক্ষেত্রে মিশে যায়, দেহহীন আত্মা বলে কিছু নেই, অমরত্বের কথা অর্থহীন (দীঘ নিকায়, ১, ৫৫)। জাবালি রামকে বলেছিলেন, চতুর ব্রাহ্মণদের ধাপ্পাবাজিতে ভুলো না; মূঢ়জনই প্রেত, পরলোক, পূজা, বলি, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদিতে আস্থা রাখতে পারে। 'চার্বাক' বা লোকায়ত পন্থীদের যেটুকু সামান্য বিবরণ "সর্বদর্শনসংগ্রহ" থেকে মেলে তা স্পষ্টতই বিদ্বিষ্ট ও বিকৃত, কিন্তু "অর্থশাস্ত্র" ও "কামসূত্রে"র কিছু উল্লেখ-উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা চলে যে কোন এক সময়ে লোকায়তবাদী চিন্তা অন্তত শিক্ষিত নাগরিকদের উপরে কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। জড়বাদী দর্শনের যে-গ্রন্থটি পরবর্তীকালে পাওয়া যায় সেটির নাম "তত্ত্বোপপ্লবসিংহ"। এটির রচয়িতা জয়রাশী অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন। তাঁর সমকালের প্রধান ধর্মগুলির পিছনে যে যুক্তির কোন সমর্থন নেই এটিই তিনি বিচার করে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন।

৩। অন্যবিধ প্রত্যয়তন্ত্রের মতো বিশেষ বিশেষ ধর্মের কেন্দ্রে যে-নীতিবোধ কাজ করে কখনো কখনো তা ধর্মবিশ্বাসীকে প্রতিষ্ঠিত অন্যায় সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে প্রেরণা দেয়। প্রতিষ্ঠিত শোষণ এবং শাসনব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের কুটুম্বিতা বা আঁতাতের কথা আগে বলেছি, এবং সভ্যতার ইতিহাসে এই সহযোগের উদাহরণ অজস্র মেলে। কিন্তু অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মীয় অভ্যুত্থান, এবং রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক অন্যায়ের ধর্মভিত্তিক সমালোচনার উদাহরণও নিতান্ত নগণ্য নয়। ধর্মীয় অভ্যুত্থানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তির দ্বারা চালিত অথবা পরিশীলিত নয়; মেসায়া অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন উদ্ধারকর্তার আবির্ভাবে বিশ্বাস এইসব আন্দোলনের বিশিষ্ট লক্ষণ; এগুলি অনেকক্ষেত্রেই সহিংস এবং অধিকতর শক্তিশালী কায়েমীস্বার্থের বা রাষ্ট্রের দ্বারা হিংস্রভাবে বিধ্বস্ত। কিন্তু এইসব আন্দোলনের পিছনে ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা কামনা যে সক্রিয় সেটি অনস্বীকার্য। বর্তমান শতাব্দীতে এইসব 'মেসায়ানিক' আন্দোলন-অভ্যুত্থান সম্পর্কে অনেক তথ্য

সংগৃহীত হয়েছে এবং এদের চরিত্র ও ফলাফল নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে ও হচ্ছে। হেবেবার, কোন্, রেডফিল্ড, হব্‌স্‌বম্‌, রাডিন, লানটারনারি, মুয়েহ্‌ল-মান প্রভৃতির গবেষণাদি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৪। এই প্রবন্ধটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি চিঠি পাই। সেইসব চিঠিপত্রে যে প্রসঙ্গগুলি উত্থাপিত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে পুনশ্চরূপে এখানে যোগ করতে চাই। মূল প্রবন্ধেও প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হয়েছে, কিন্তু পাঠক-পাঠিকারা যেভাবে প্রশ্ন তুলেছেন অথবা মন্তব্য করেছেন তা মনে রেখে চারটি শিরোনামে আমার বক্তব্য স্পষ্টতর করার চেষ্টা করছি।

ক। ধর্ম ও বিজ্ঞান: সব ধর্মেরই একটি বড়ো অংশ জুড়ে থাকে বিশ্বজগতের উৎপত্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা, সেটি তার পৌরাণিক অংশ। জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বোঝার জন্য সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের ব্যাখ্যা মানুষের পক্ষে জরুরী। যখন জগৎ-সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হয় নি এবং কাল্পনিক ব্যাখ্যাকে যাচাই করে নেবার চিন্তাপদ্ধতি, ভাষা, সাধিত্র প্রভৃতি উদ্ভাবিত হয় নি, তখন পৌরাণিক ব্যাখ্যার ভিতর দিয়েই মানুষের জ্ঞানান্বেষণ ও যুক্তিশীলতা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ পৌরাণিক ব্যাখ্যাকে কালবিরুদ্ধ করে। ধর্ম যে ব্যাখ্যা দেয় সেটিকে ধর্মবিশ্বাসীরা মনে করেন প্রশ্নাতীত, প্রমাণোর্ধ্ব, নিত্য। পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বেরিয়েছিল কিংবা যিহোবা ছয় দিনে বিশ্বজগৎ রচনা করেছিলেন, এসব কল্প-কাহিনীকে বিশ্বাসীরা চিরন্তন সত্য বলে মনে করেন এবং কেউ সে-সম্পর্কে সংশয়ী হলে তাকে ঐহিক এবং পারলৌকিক, সামাজিক এবং দৈহিক শাস্তির ভয় দেখান। অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিককে বিস্তর অধ্যবসায় করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, এবং কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই চরম সত্য বলে উপস্থাপিত হতে পারে না। তথ্য এবং যুক্তির প্রতি নিষ্ঠা বৈজ্ঞানিকের বিশিষ্ট চারিত্রিক। যে ব্যাখ্যা তিনি উপস্থাপিত করেন বা গ্রহণ করেন তা যে পরে ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হতে পারে এ সম্পর্কে সচেতনতা তাঁর সত্যানুসন্ধানেরই অঙ্গ। এই কারণে ধার্মিক ব্যাখ্যার পিছনে যে মনোভাব আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পিছনে যে মনোভাব এই দুইয়ের মধ্যে রফা সম্ভব নয়। ধর্মবিশ্বাসীরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাকে দমন করার চেষ্টা আগাগোড়াই করে এসেছেন এবং যেখানে তাঁদের হাতে দমন করবার ক্ষমতা নেই সেখানে বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে আধ্যাত্মিক বাক্‌ছল দিয়ে ঝাপসা করার চেষ্টা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশের জন্য যে মানসিক বয়ঃপ্রাপ্তি এবং নিত্য-জাগ্রত প্রশ্নশীলতা প্রয়োজন, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এখনো তা গড়ে ওঠে নি। অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ এখনো পর্যন্ত আদিম মানুষ এবং শিশুর মতো নিশ্চিত চরম উত্তর চায়—শিশুরা ভাবে এটি তাদের মা-বাবা দিতে পারে, বয়স্ক শিশুরা

ভাবে এটি দিতে পারে পুরাণকাহিনী, ধর্ম, গুরু, সাধুসন্ত। বৈজ্ঞানিক জানেন তথ্যনির্ভর সব উত্তরই আংশিক এবং শর্তাধীন—কোন ব্যাখ্যাই বিচারোর্ধ্ব বা অপরিবর্তনীয় নয়। প্রশ্ন যেখানে সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত, সুনির্দিষ্ট সেখানে তার নির্ভরযোগ্য উত্তর সম্ভব (যেমন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে), কিন্তু যেখানে সে-প্রশ্ন বহুমুখী ও ব্যাপক সেখানে তথ্য-সংগ্রহে, ব্যাখ্যায়, প্রমাণে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকতেই পারে। বৈজ্ঞানিক সে-কথা ভেবে ছাত্রদের লোভ দেবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞতা দাবি করেন না, অপরপক্ষে চরম উত্তর অপ্রাপ্য বলে তিনি মন এবং হাত গুটিয়েও বসে থাকেন না। উপযোগী তথ্যসংগ্রহে, বিষয়মুখিতার অনুশীলনে, ধারণা এবং সাধিত্রের সূক্ষ্মতাসাধনে, প্রকল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি নিজেকে নিয়ত নিয়োজিত রাখেন এবং অপর বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য ও সমালোচনা বিশেষ যত্নের সঙ্গে অনুধাবন করেন। ধার্মিকরা তাঁদের বিশ্বাসাদি বিচারোর্ধ্ব ও অপরিবর্তনীয় মনে করার ফলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের মধ্যে একত্র হয়ে পরস্পরের ধর্ম নিয়ে চর্চার উদাহরণ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। এবং ইতিহাসে ধর্মযুদ্ধের ভয়ংকরতাই অনেক বেশি প্রাবল্যে বারবার দেখা যায়। অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিকরা পরস্পরের যুক্তি, তথ্য, প্রমাণাদি বিচার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মতৈক্যে পৌঁছতে পারেন এবং তাঁদের বিভিন্ন প্রকল্প ও ব্যাখ্যা ক্রমেই অধিকতর নির্ভরযোগ্যতা ও সর্বজনগ্রাহ্যতা অর্জন করে। প্রকৃত শিক্ষার সূত্রে বৈজ্ঞানিকতার এই মনোভাবের প্রসারের ফলে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ বৌদ্ধিক বয়ঃপ্রাপ্তি লাভ করবে তখন জ্ঞানের দিক থেকে ধর্মীয় ব্যাখ্যার কালবিরুদ্ধতা তাদের কাছে সহজেই ধরা পড়বে।

খ। ধর্ম ও শিল্প-সাহিত্য: উভয় ক্ষেত্রেই কল্পনা-উদ্ভাবনার ভূমিকা প্রধান। যা আছে, যা অভিজ্ঞতা-জাত এবং অভিজ্ঞতা-সমর্থিত তা থেকে উপাদান নিয়ে মন এমন সব রূপ রচনা করে, রচনার পূর্বে যারা ছিল না। কল্পনা অনস্তিত্বকে অস্তিত্ববান্ করে। শিল্প বিভিন্ন মাধ্যমের ভিতর দিয়ে সেই রূপকে অপরের কাছে প্রত্যক্ষ করে তোলে। সেই কল্পনাপ্রসূত রূপ যে অভিজ্ঞতাপ্রসূত জগতের চাইতেও প্রকৃত, নানা মন্ত্রতন্ত্র, পূজাপ্রকরণের দ্বারা এই বিশ্বাসকে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে।

এখন শিল্পসাহিত্যের একটা বড়ো অংশ দীর্ঘকাল ধরে ধর্মকে সমর্থন করেছিল এবং ধর্মের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা এ দুটির মধ্যে কোন অচ্ছেদ্য বা সম্পূরক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তথ্য অথবা যুক্তি এই অচ্ছেদ্যতার ধারণাকে সমর্থন করে কি? অতীত কালেও বেশ কিছু স্থাপত্য, ভাস্কর্য, প্রতিকৃতি চিত্র ও প্রাকৃতিক চিত্র, গাথাকাহিনী, সংগীত, কবিতা, নাটক-উপন্যাস পাওয়া যায় যাদের বিষয়বস্তু ও প্রতিন্যাস স্পষ্টতই ঐহিক, যাদের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক যদি আদৌ থাকে তা নিতান্তই ক্ষীণ। অপরপক্ষে গত তিনশো বছর কাল ধরে শিল্প স্পষ্টতই ধর্মীয় বিষয় এবং মনোভাব থেকে সরে

এসেছে—ব্যতিক্রম থাকা সত্বেও এই আভিমুখ্য স্পষ্ট। অর্থাৎ ধর্মের উপরে নির্ভরতা শিল্পের পক্ষে মোটেই অপরিহার্য নয়, যদিও ধর্মের আবেদন ও প্রসারের জন্য শিল্পের সহযোগ সম্ভবত বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শিল্প এবং ধর্ম দুই-ই কল্পনাজাত হলেও দুইয়ের মধ্যে অন্তত দুটি মৌলিক পার্থক্য আছে বলে মনে করি। শিল্প যে কাল্পনিক রূপের জগৎ রচনা করে এবং আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে তোলে সেটিই একমাত্র প্রকৃত জগৎ, এমনকি আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগতের চাইতে অধিকতর সত্য জগৎ—এমনতর দাবি শিল্পের আবেদনের জন্য নিষ্প্রয়োজন। শিল্প একটি স্বয়ন্তর জগৎ রচনা করে আমাদের প্রাত্যহিক জগতের পাশাপাশিই যেটিকে আমরা তার নিজগুণে গ্রহণীয় বিবেচনা করি। এটি বিশুদ্ধ যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে সব চাইতে স্পষ্ট, কিছু স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নৃত্য, অভিনয় এমনকি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এটি অভিজ্ঞতাসিদ্ধ। অয়দিপাউস, দ্রৌপদী, হ্যামলেট, ফাউস্ট, অথবা কাফকার- "কে"—এরা প্রত্যেকেই এদের স্রষ্টার কল্পিত চরিত্র; এদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের প্রত্যহিক অভিজ্ঞতার কিছু মেলে, অনেকটাই মেলে না; কিন্তু এদের প্রত্যেকের স্রষ্টা নিজের নিজের কল্পনা ও শিল্পনৈপুণ্যের জোরে এদের ভিতরে এমন শক্তি সঞ্চার করেছেন যে এদের চারিত্র্য এবং কাহিনী আমাদের কাছে প্রবলভাবে প্রত্যক্ষ। অপর পক্ষে সেই কারণে এদের সান্নিধ্যে আমাদের পরিচিত জগৎকে মায়া অথবা তুচ্ছ অথবা অসত্য মনে করার কারণ ঘটে না। শিল্পের জগৎ অভিজ্ঞতার জগৎকে গ্রাস করে না, তাকে নিজের অধীন করে না, তা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার পাশাপাশি নিজের গৌরবে উপস্থাপিত হয়। অপরপক্ষে ধর্মের কল্পিত জগৎ সংসারে আস্তিত্বিক হীনতা আরোপ করে তার কল্পিত নায়ক-নায়িকাকে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করে, তাদের উপরে দেবত্ব অথবা অলৌকিকত্ব আরোপ করে সেই কল্পিত জগৎকেই পরম সত্য বলে দাবি করে। সেই জগৎ অসহিষ্ণু, সর্বগ্রাসী এবং ফলে এক ধর্মের কল্পিত জগতের সঙ্গে আর-এক ধর্মের কল্পিত জগতের সংঘর্ষ অনিবার্য। একই পাঠকের পক্ষে অভিজ্ঞানশকুন্তলা, আরব্যরজনী এবং কিং লিয়রের জগতে বিস্ময়াকুল চিত্তে প্রবেশ করা স্বাভাবিক। চারুদত্ত, হ্যামলেট, হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্টার কিংবা মাদাম বোভারির জগতে আমরা আমন্ত্রিত; সেখানে অনুভব, সম্ভোগ, বিচার-বিশ্লেষণ, প্রবেশ-প্রস্থানের স্বাচ্ছন্দ্য আছে, আনুগত্যের জন্য কোনো জুলুমবাজী নেই। কিন্তু মোজেস-এর জগৎ, খৃস্টের জগৎ, কৃষ্ণের জগৎ, অথবা মহম্মদের জগৎ একাতপত্রতা দাবি করে। একাশ্রয়ী ছাড়া ঐ জগতে অপরের প্রবেশ ধর্মবিশ্বাসীদের মতে নিষিদ্ধ। জিজ্ঞাসুরূপে ওইসব জগৎকে আমরা বোঝবার চেষ্টা করলে বিশ্বাসীরা বলেন পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে ওই জগতে ঢোকা অন্যের অসাধ্য। এমনকি যাঁরা ধর্মজগতের পোপ, খলিফা, পেট্রিয়ার্ক, শঙ্করাচার্য মার্কা প্রাচীন মহাসঙ্ঘের মালিক নন, নিতান্তই অর্বাচীন ছোটোখাটো সম্প্রদায়ের নেতা

—রামকৃষ্ণ, সৎসঙ্গ, হরেকৃষ্ণ, ডিভাইন লাইট, আনন্দময়ী, সত্যসাঁই ইত্যাদি —তাঁদের জগৎও একচেটিয়াপন্থী এবং পরস্পরের জগতের প্রতি অসহিষ্ণু।

দ্বিতীয় পার্থক্য হল ধর্মীয় কল্পনা শুধু স্বকীয় জগৎ রচনা করে তৃপ্ত নয়, তাতে স্পষ্ট নির্দেশ থাকে, ঐ জগৎকে যারা চরম সত্য বলে মানে তাদের কী কী করণীয় এবং কী কী অকরণীয়। এবং যাঁরা বিশেষ বিশেষ ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব ও অধিকার নিজেদের উপরে আরোপ করেছেন তাঁরা সংগঠিত পরাক্রমে ব্যবস্থা করেন যাতে ঐ সব বিধিনিষেধ প্রতিপালিত হয় এবং পালিত না হলে পাপীজন যথাযথ শাস্তি পায়। টমাস মান এই বিষয়টি নিয়ে একটি চমৎকার গল্প লিখেছিলেন। গল্পটির নাম—"দি টেব্‌লস্‌ অব্‌ দি ল"। এটি মোজেস এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের দশমহানির্দেশ সম্পর্কিত। ইহুদিদের মধ্যে যারা মোজেস -এর নির্দেশ মানে নি মোজেস-এর আজ্ঞায় যোশুয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার নামে তাদের সকলকে হত্যা করেন। মোজেস নিজের হাতে নির্দেশগুলি পাথরে খোদাই করে তাঁর অনুযাত্রিকদের বলেন, অদৃশ্য ইয়াহ্‌ওয়ে এই নির্দেশ-গুলি দিয়েছেন। গল্পের শুরুতে মান মোজেস সম্পর্কে লিখেছেন :

His birth was disorderly. Therefore he passionately loved order, the immutable, the bidden and the forbidden··· He was sensual, therefore he longed for the spiritual, the pure and the holy—in a word, the *invisible*—for this alone seemed to him spiritual, holy and pure.

গল্পের শেষে তিনি নবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মোজেসকে দিয়ে বলিয়েছেন :

And the Lord says, I shall raise my foot and shall trample him unto the mire, to the bottom of the earth I shall cast the blasphemer, one hundred and twelve fathoms deep...... and all the people said Amen.

শিল্পসাহিত্য এই ধরনের কোন ব্যবহারিক নির্দেশ দেয় না, এবং শিল্পী-সাহিত্যিকরা সংগঠন তৈরি করে বেয়াড়া পাঠক-পাঠিকাদের কোন শাস্তিবিধান করেন না। হ্যামলেটের অপ্রেমে-দ্বিধাদ্বন্দ্বে-যন্ত্রণায় আমরা অংশভাক্‌ হই, কিন্তু আমাদের কী করণীয় সে-সম্পর্কে ওই নাটক থেকে কোন নির্দেশ পাই কি? খাজুরাহো, কোনারকের মিথুনমূর্তি থেকে আমাদের মনে গভীর আনন্দ সঞ্চারিত হয়, কিন্তু আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন উপদেশ ঐসব মন্দিরে লিখিত নেই। (শাস্ত্রকারেরা ঐসব ভাস্কর্যের যেসব ব্যাখ্যা করেন, সেসব তাঁদের ধর্মতত্ত্ব থেকে নির্গত, শিল্পকর্মের ভিতরে সেই ব্যাখ্যার কোন সমর্থনই মেলে না।) কোন গান, ছবি, নাটক কাহিনী বা উপন্যাস যদি কারো ভালো না লাগে তার জন্য সেই ব্যক্তিকে কোন পাপ অর্শায় বলে কেউ মনে করে না। অবশ্য যতক্ষণ সেটিকে শিল্প হিসাবে ভাবা যায় ততক্ষণই একথা খাটে,

তাকে ধর্মীয় বস্তু বা ধর্মশাস্ত্র হিসেবে ধরলে তখন ধর্মের অন্ধ অসহিষ্ণু দাবি সেক্ষেত্রেও করা হয়। কিন্তু কর্তব্য নিরূপণের দায়িত্ব থেকে মুক্ত বলেই শিল্প শিল্প। কর্মের ও বস্তুজগতের চৌহদ্দির বাইরে শিল্পের যে সিদ্ধতা ও শুদ্ধতা ক্রোচে তাকেই বলেছেন তার বিশিষ্ট "ইস্থেটিক" গুণ। এই শিল্পকান্তির জন্যই শিল্প এত মূল্যবান। ধর্ম শিল্পকে নিজের প্রচারের কাজে ব্যবহার করে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় লোপ পাবার পরেও এবং ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন স্ত্রী-পুরুষদের কাছেও ঐ ধর্মমতের সংশ্লিষ্ট শিল্প গভীর আবেদন করতে সক্ষম।

গ। ধ র্ম ও নৈ তি ক তা: অনেকের ধারণা ধর্মবিশ্বাস নৈতিকতার উৎস ও ধারক, এবং ধর্মবিশ্বাসে ভাঙন ধরলে ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনে ব্যাপক দুর্নীতি দেখা দিতে বাধ্য। সব ধর্মেই নীতিনির্দেশ আছে এবং কোন কোন ধর্মবিশ্বাসীর জীবন নৈতিক বিচারে শ্রদ্ধার্হ, একথা লক্ষ করার পরও পূর্বোক্ত ধারণাকে তথ্যসমর্থিত বা যুক্তিসমর্থিত মনে হয় না। মোহান্ত, পুরুত, মোল্লা, পীর, চার্চের বড়োছোটো কর্মকর্তা এবং প্রচারকদের মধ্যে যত দুর্নীতি অতীতে এবং বর্তমানে দেখা যায় তার তুলনা রাজনৈতিক নেতা, সরকারী আমলা, ব্যবসায়ী-পুঁজিপতি, শ্রমিক-সংগঠনের সর্দার বা মস্তানদের মধ্যেই মিলতে পারে। ধর্মবিশ্বাস ধর্মীয় মাতব্বরদের মধ্যে কিছু কম নয়; কিন্তু তার ফলে এঁদের বিবেকিতা কিছু দৃঢ় হয়ে ওঠে নি।

যতোটুকু বুঝি নৈতিকতার জন্য অন্তত পাঁচটি শর্ত দরকার। প্রথমত, মূল্য-বোধ ও ঔচিত্যবোধ। অর্থাৎ যা করি এবং যা করা উচিত মনে করি, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যের চেতনা। কোন্ বিশেষ অবস্থায় কী করা উচিত তা নিয়ে মতভেদ, এমনকি কখনো কখনো সমাধানহীন অনিশ্চয়তাও দেখা দিতে পারে, কিন্তু যা আমরা সচরাচর করে থাকি এবং যা করণীয় মনে করি, এ দুটি যে ঠিক এক ব্যাপার নয় এ-বোধ মানুষ মাত্রেরই আছে। এই বোধ বাদ দিয়ে নৈতিকতা অকল্পনীয়। দ্বিতীয়ত, ঔচিত্যবোধ যাকে অবলম্বন করে আকার পায় সেটি হল মূল্যগ্রাম বা মূল্যাবলী। অর্থাৎ শুধু ঔচিত্যবোধ নয়, ব্যক্তি এবং অবস্থা-নির্বিশেষে সমস্ত মানবপ্রজাতির পক্ষে করণীয় এবং গ্রহণীয় কোন কোন আদর্শ আছে যাদের আমরা মূল্য দিয়ে থাকি এবং গুণ হিসেবে যাদের অনুশীলন ঔচিত্যবোধে বিষয়সঞ্চার করে, করণীয়ের নির্ণায়ক হয়। স্বাধীনতা, সৃষ্টিশীলতা, জ্ঞান, সততা, প্রেম, বন্ধুত্ব, সহযোগ, করুণা, পরার্থপরতা, আপন আদর্শ অনুযায়ী বাঁচবার সাহস—এ সবকেই মানুষ মূল্যবান মনে করে। অপরপক্ষে পরাধীনতা, ধ্বংসবৃত্তি, অজ্ঞতা, মিথ্যাচরণ, পৈশুন্য, কলহ-পরায়ণতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, ভীরুতা—এগুলিকে মানুষ ক্ষতিকর এবং সাধ্যমতো বর্জনীয় বলেই মানে। মূল্যাবলীর এই তালিকা স্বীকৃতভাবেই অসম্পূর্ণ এবং এর প্রত্যেকটিই সকলের কাছে সমান মূল্য না-ও পেতে পারে, কিন্তু মূল্যগ্রামের

অস্তিত্ব না মেনে নিলে ব্যক্তির এবং সমাজের নৈতিক জীবন অসম্ভব হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, যাকে আমরা উচিত এবং মূল্যবান বলে মনে করি অন্তত মনের দিক থেকে তাকে বেছে নেবার স্বাধীনতা ও সামর্থ্য মনুষ্যমাত্রেরই আছে। এই স্বাধীনতা মানবীয় অস্তিত্বের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অন্য প্রাণীরা যা করে তার সম্ভবত সবটাই পূর্বনির্দিষ্ট, তাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বাছবার প্রশ্ন আদৌ ওঠে কি না সন্দেহ। কিন্তু মানুষকে পদে পদেই বিকল্পের ভিতরে বাছতে হয়, এবং সেই বাছবার সামর্থ্য ও চারিত্রিকের ভিতরেই তার প্রাজাতিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। খিদে পেলে এবং আহার্য জুটলে মানুষও অন্য প্রাণীর মতো খেয়ে থাকে, কিন্তু মানুষই সম্ভবত একমাত্র প্রাণী যে সামনে খাদ্য থাকলেও ঔচিত্যের বিশ্বাসে স্বেচ্ছায় উপবাস করতে পারে, নিজের খাদ্য অপর কোন বুভুক্ষুকে দিয়ে দিতে পারে, অথবা তার সঙ্গে ভাগ করে খেতে পারে। তার বাছাই অন্যদের সমর্থন লাভ করবে কি না অথবা বাছাই করার পরও সে তার নির্বাচন অনুযায়ী আচরণ করতে পারবে কি না, সেটি এক্ষেত্রে আলোচ্য নয়। আমি যে সূত্রটির উপরে এখানে জোর দিচ্ছি সেটি হল মূল্যবানকে মূল্যবান বলে বুঝতে পারার পর অন্য বিকল্প থাকা সত্ত্বেও মনে মনে মূল্যবানকে নির্বাচন করবার যে স্বাধীনতা, নৈতিকতার যে কোন ব্যাখ্যাতেই সেটির অস্তিত্ব আমরা মেনে নিতে বাধ্য।

চতুর্থত, ঔচিত্যবোধ, মূল্যগ্রাম ও বাছাইয়ের স্বাধীনতার সঙ্গে আরেকটি প্রধান মানবীয় বৃত্তি ও সামর্থ্যের ক্রিয়া এই প্রসঙ্গে অপরিহার্য। এটি হল মানুষের যুক্তিশীলতা। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং প্রাজাতিক বিকাশে স্বাধীনতাবৃত্তি ও যুক্তির ভূমিকা বিনিশ্চায়ক। নৈতিকতা বিভিন্নভাবে যুক্তির উপরে নির্ভরশীল। তার ভিতরে কয়েকটি উল্লেখ করি। প্রথমত, মূল্যাবলীর প্রত্যেকটির অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝবার ব্যাপারে যুক্তি সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, কোন কোন বিশেষ অবস্থায় একটি মূল্য বা আদর্শের নির্দেশ আপাতদৃষ্টিতে আরেকটি মূল্য বা আদর্শের নির্দেশের বিপরীত ঠেকতেও পারে। সেখানে ওই আপাত-বিরোধী করণীয় দুটির পিছনকার উদ্দেশ্য ও তাদের পরবর্তী ফলাফল বিবেচনা করে যুক্তি নৈতিক সিদ্ধান্তে আসায় সাহায্য করে। গুটি দুই নিতান্ত সহজ ও পরিচিত দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। সত্যকথন একটি কর্তব্য, শরণাগতকে রক্ষা করা আর-একটি কর্তব্য। কোন অবস্থায় সত্যকথনের ফলে শরণাগতের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলে যুক্তি প্রাণরক্ষাকে সত্যকথনের চাইতে শ্রেষ্ঠতর কর্তব্য বিবেচনা করবে এটি প্রত্যাশিত। বন্ধুতা মূল্যবান, সমাজের সামূহিক স্বার্থরক্ষাও কর্তব্য। কোন বিশেষ অবস্থায় এই দুটির মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেবার প্রশ্ন উঠতে পারে। সেক্ষেত্রেও যুক্তিই আমাদের নির্ভর। তৃতীয়ত, যা আমরা মূল্যবান বা উচিত বলে বিবেচনা করি কীভাবে সেটির অনুসরণ করা যায়, সে-প্রশ্নের উত্তরও

যুক্তির সাহায্যে খুঁজতে হয়। এবং চতুর্থত, আমরা শ্রেয় বা প্রকৃষ্ট বলে যে-পথটি নির্বাচন করি সেটি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, আমাদের স্বেচ্ছাবৃত কর্মের ফলাফল কী হতে পারে তার পূর্বাভাস ও হদিশ যুক্তিই দিতে পারে। যে-শুভেচ্ছা যুক্তির দ্বারা অনালোকিত তা যে অনেক সময়ে বিস্তর ক্ষতির কারণ হয় তার অজস্র উদাহরণ মেলে।

নৈতিকতার পাঁচটি শর্তের কথা বলেছি। পঞ্চম শর্ত হল প্রাজাতিক ঔচিত্য-বোধ ও মূল্যবোধের ভিত্তির উপরে বিশেষ বিশেষ মূল্য, আদর্শ বা গুণের প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা। যে-মনোভাব মানুষের বিকাশে এবং পারস্পরিক যোগসাধনে সাহায্য করে সেটির সংস্থাপন ও প্রচারের উপরে ব্যক্তির এবং সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। আমাদের ভিতরে প্রেম-অপ্রেম, সৃজনশীলতা ও ধ্বংসপ্রবণতা, সততা ও মিথ্যাচার, দয়া এবং নিষ্ঠুরতা, সাহস ও ভীরুতা, স্বাধীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতা সবই বিদ্যমান। এইসব আভিমুখ্যের মধ্যে যেগুলি মানুষের বিকাশের সহায়ক সেগুলির প্রতি শিক্ষা, পারিবারিক জীবন, সাংস্কৃতিক আচারঅনুষ্ঠান, রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক সংগঠনের ভিতর দিয়ে ব্যাপক আনুগত্য গড়ে তুলতে পারলে সাধারণ মানুষের পক্ষে নৈতিক নির্বাচন সহজতর হয়।

প্রথম চারটি শর্তের সঙ্গে মানুষ বিষয়ে আমাদের ধারণার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ঔচিত্যবোধ, মূল্যগ্রাম সম্পর্কে চেতনা, স্বাধীন নির্বাচনের সামর্থ্য এবং যুক্তির দ্বারা উপায় ও ফলাফল নির্ণয়ের শক্তি—সম্ভাবনা রূপে এগুলি মানুষের প্রাজাতিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ সম্পর্কে এই মানবতন্ত্রী প্রকল্প নৈতিকতার ভিত্তি। কোন তুরীয় শক্তির প্রকল্প এক্ষেত্রে অবান্তর। তবে পঞ্চম শর্তটির ক্ষেত্রে ধর্মের একটি সীমাবদ্ধ কিন্তু উল্লেখ্য ভূমিকা আছে। প্রচলিত কোন না কোন ধর্মীয় শিক্ষা ও আচার-অনুষ্ঠানের সূত্রে বিশেষ বিশেষ মূল্য বা গুণের প্রতি আনুগত্য বহু স্ত্রীপুরুষের মনে এতাবৎ সচরাচর গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গেও দুটি কথা মনে রাখা দরকার। কোন প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সাহায্য না নিয়েও পারিবারিক জীবন, বিদ্যালয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সরকারী আইন-কানুন প্রভৃতির মাধ্যমে নির্বাচিত মূল্যগ্রামের প্রতি সাধারণজনের আনুগত্য গড়ে তোলা সম্ভব এবং অনেক দেশে সেই চেষ্টা আধুনিক কালে হয়েছে এবং হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যে স্বাধীন নির্বাচন নৈতিকতার প্রাণ সেটি ধর্মীয় শিক্ষায় ও আচার-অনুষ্ঠানে অস্বীকৃত ও নিরুদ্ধ। ঈশ্বরের নির্দেশে নয়, শাস্ত্রের নির্দেশে নয়, নরকের ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে নয়, আমার নিজস্ব বিবেক ও যুক্তির সাহায্যে আমি স্বাধীনভাবে আমার কর্তব্য বেছে নেব, এটিই নৈতিকতার বিশিষ্ট লক্ষণ। ধর্ম আদৌ এটিকে প্রশ্রয় দেয় না। প্রকৃত নৈতিকতার সঙ্গে এক্ষেত্রে ধর্মের স্পষ্ট বিরোধ আছে।

ঘ। ধ র্মী য় অ ভি জ্ঞ তা : ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, শাস্ত্র,

গুরু, আচার-অনুষ্ঠান এসব বাইরের জিনিষ, আসল ব্যাপার হচ্ছে এক ধরনের অপরোক্ষানুভূতি যা ধর্মের উৎস। এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ব্যাপারটি নাকি বড়ো গুহ্য, যাঁদের হয়েছে তাঁরাই শুধু জানেন, অন্যদের কাছে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। একদা-প্রসিদ্ধ 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' প্রবন্ধগ্রন্থের লেখক প্রয়াত কৌতুকী শিবরাম চক্রবর্তীর অনুসরণে আমিও বলতে পারতাম যে যা গুহ্য তা বরং গুহাতেই নিহিত থাক। কিন্তু আমি কৌতূহলী হয়ে আমার চেনাজানার মধ্যে ঐসব বিশ্বাসীদের শুধিয়েছি, আপনার কি সেই অপরোক্ষানুভূতি হয়েছে? অথবা আপনার, অথবা আপনার? না, অন্তত আমার পরিচিতদের মধ্যে কেউই ব্রহ্মাস্বাদের দাবি করেন নি। তবে বলেছেন যাঁদের হয়েছে তাঁদের কথা নাকি তাঁরা জানেন। কিন্তু আমার না জানা এবং তাঁদের জানা এইসব মহাত্মাদের যেটুকু বিবরণ গ্রন্থাদি ও পরিচিত ব্যক্তিদের সূত্রে পেয়েছি তা থেকে অনুমান করি অধ্যাত্মজ্ঞান বলে কিছু থাক বা নাই থাক এইসব তুরীয়মার্গীরা সকলেই সম্মোহন বিদ্যায় পারঙ্গম এবং ভেলকিবাজিতে ওস্তাদ।

তবু তত্ত্ব হিসেবে হয়তো স্বীকার করা চলে নানা ধরনের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্যে একজাতের অভিজ্ঞতাকে 'ধর্মীয়' অভিজ্ঞতা নাম দেওয়া যায়। আকাশ, সমুদ্র, হিমালয়ের আনন্ত্যের সান্নিধ্যজাত বিস্ময়, প্রথম প্রেমের গভীরতার উপলব্ধি, শিল্পসৃষ্টির অভিনিবেশ ও আনন্দ, জটিল, বৌদ্ধিক সমস্যার আকস্মিক বিদ্যুৎক্ষিপ্র সমাধান, মাদকসেবনের কল্যাণে সেবকের চেতনায় বিবিধ অবাস্তব রূপ ও ঘটনাবলীর সাময়িক পরিদৃশ্যমাণতা—এসব বিভিন্ন জাতীয় অভিজ্ঞতা আমাদের প্রাত্যহিক খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, কাজকর্মের অভিজ্ঞতা থেকে বেশ কিছুটা অন্য ধরনের। হয়তো বা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এদেরই মতো বিশিষ্ট এবং স্মরণীয় কোন অভিজ্ঞতা যা সকলের প্রাত্যহিক জীবনে না ঘটতে পারে। কিন্তু কোন অভিজ্ঞতাকে সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা হিসেবে মানার অর্থ নয় যে বিশ্বাসী ঐ অভিজ্ঞতায় যে অর্থ আরোপ করছেন সেটি বিনা প্রমাণ-পরীক্ষায় মেনে নেওয়া হচ্ছে। মদ্যপানের মাত্রা বাড়ালে মাতাল ব্যক্তি চোখের সামনের বস্তুকে দ্বিগুণিত রূপে দেখেন; তাঁর দেখাটা মোটেই অবিশ্বাস্য নয়, শারীরবৃত্তে তার ব্যাখ্যাও মেলে, কিন্তু যে বস্তুটি তিনি দেখছেন সেটি বাস্তবে দ্বিগুণিত হয় না। সিদ্ধি-সেবী তাঁর পায়ের নিচের পথকে ঢেউ খেলানো ভাবতে পারেন, হাওয়ায় উড্ডীন গোলাপি হাতির লাবণ্য তাঁকে গদ্‌গদচিত্ত করতেও পারে, কিন্তু ফলে সমতল পথে চড়াই উৎরাই রচিত হয় না, গোলাপি হাতিও হাওয়ায় ওড়ে না। যাঁদের সচরাচর 'মরমী' বলা হয় তাঁরাই সম্ভবত ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ। তাঁদের সেই অভিজ্ঞতার উপাদান নিয়ে তাঁদের কল্পনা নানা রূপ রচনা করে এবং অনেক সময় প্রতীকের সূত্রে কিংবা কবিতায়, গানে, ছবিতে আকার নিয়ে সেই রূপ অন্যদের কাছে পৌছোয়। এসব থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতার সততা ও কল্পনার সমৃদ্ধতার পরিচয় মেলে, কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার

বাইরে কোন দেবতার বা তুরীয় লোকের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অবশ্যই মনস্তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়, কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো অধিবিদ্যাত্মক প্রস্তাব দাঁড় করানো অযৌক্তিক।

রেনেসাঁস ও ইতিহাসতত্ত্ব

১। উদাহরণ হিসেবে দ্রষ্টব্য: Hu Shih, *The Chinese Renaissance*; G. Antonius, *Arab Awakening*; R. Schwab, *La Renaissance Orientale* ইত্যাদি।

২। এই প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের এই বইগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য: *India in Transition*, 1922; *Our Problems*, 1937; *Fascism*, 1938; *Materialism* 1940; *India's Message*; *Crime and Karma* (ত্রিশের দশকে কারাগারে রচিত এবং চল্লিশের দশকে প্রকাশিত); *Reason, Romanticism and Revolution*, 2 vols., 1959।

৩। নয় খণ্ডে বাঁধানো এই পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে দিল্লীর নেহরু মিউজিয়ামে সংরক্ষিত।

৪। B. B, Misra, *The Indian Middle Classes*, 1961; A. Seal, *The Emergence of Indian Nationalism*, 1968.

৫। রেনেসাঁসী ভাবুকদের ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: B. Croce, *History, its Theory and Practice*, 1921; J. W. Thompson, *A History of Historical Writing*, 1942।

৬। W. K. Ferguson, *The Renaissance in Historical Thought*, 1948।

৭। ভাসারি, এভরিম্যানস্ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৮।

৮। আঠারো শতকী চিন্তার সুসন্নিবদ্ধ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: Ernst Cassirer, *The Philosophy of the Enlightement*, 1951।

৯। প্রগতিতত্ত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের জন্য দ্রষ্টব্য: J. B. Bury, *The Idea of Progress*, 1920 (ডোভার সংস্করণ, ১৯৫৫)।

১০। J. Michelet, *Histoire de France*, VII *La Renaissance*, 1855, পৃঃ ৭, ১৩।

১১। J. Burckhardt, *Die Cultur der Renaissance in Italien*, 1860 (মিডলমোর-কৃত ইংরেজী অনুবাদ, ফেডন প্রেস সংস্করণ, ১৯৪৫)।

১২। E. Cassirer, *Individuum Und Kosmos in der Philosophie der Renaissance*, 1927।

১৩। H. Baron, *The Crisis of the Early Italian Renaissance*, 2 vols., 1955।

১৪। A. von Martin, *Soziologie der Renaissance*, 1932 (ইংরেজী অনুবাদ ১৯৪৪)।

১৫। Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (মূল জার্মান ১৯০৪-৫, ইংরেজী সংস্করণ ১৯৩০)।

১৬। W. Sombert, *Der Bourgeois*, 1913 (ইংরেজী সংস্করণ, ১৯১৫); *The Jews and Modern Copitalism* (মূল জার্মান ১৯১১ ; ইংরেজী অনুবাদ ১৯১৩)।

২৫। W. Dilthey, *Intuition and Analysis of Men in the 15th and 16th Centuries* (১৮৯১-৯২); M. Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*।

২৬। বিশেষ করে রেনেসাঁস প্রসঙ্গে প্রশ্নগুলি উঠলেও এগুলি সাধারণভাবে ইতিহাস-দর্শনেরও প্রশ্ন। দ্রষ্টব্য: H. Meyerhoff (ed), *The Philosophy of History in Our Time*, 1959; H. S. Hughes, *Consciousness and Society*, 1958; F. M. Powicke, *Modern Historians and the Study of History*, 1955; R. Klibansky and H. J. Paton (ed.), *Philosophy and History*, 1936; B. Croce, *History as the Story Liberty* 1955।

ভারতীয় ঐক্যের সন্ধানে

১। ভারতবর্ষের যে কোনো প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থে এই বিবরণের সমর্থন মিলবে। কৌতূহলী পাঠককে বলি C. Collin Davis, *An Historical Atlas of the Indian Peninsula*, Oxford University Press, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, বইটি দেখতে। এটিতে দুই মলাটের মাঝখানে আটচল্লিশটি মানচিত্রে এই উপমহাদেশের বৈচিত্র্য এবং প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে রাষ্ট্রিক ওঠাপড়ার প্রধান পর্বগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

২। ব্রহ্মগুপ্তের বিবরণ (সপ্তম খৃষ্টীয় শতাব্দী) অনুসারে পৃথিবী বর্তুলাকার এবং তার পরিধি পাঁচ হাজার যোজন। ব্যাশাম লিখেছেন "প্রতি যোজন যদি সাড়ে চার মাইলের মতো হয় তাহলে এই হিসেব খুব ভ্রান্ত নয়।" A. L. Basham, *The Wonder that was India*, Grove Press, 1954, পৃ: ৪৮৮।

৩। R. C. Majumder in C. H. Philips (ed.), *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, London, 1961.

৪। Swami Dayanand, *Satyartha Prakasha* Eng. tr. by Chiranjiva Bharadwaja; 3rd edn., 1927.

৫। যেসব লেখায় বঙ্কিম কল্পিত এই ভাবরূপের পরিচয় মেলে তাদের ভিতরে বিশেষভাবে উল্লেখ্য: বঙ্গদেশের কৃষক; সাম্য; কমলাকান্তের দপ্তর; আনন্দমঠ; কৃষ্ণচরিত্র; ধর্মতত্ত্ব।

৬। অরবিন্দ ঘোষের *New Lamps for Old* প্রবন্ধগুলি বম্বের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ১৮৯৩ সালের ৭ই আগষ্ট থেকে ১৮৯৪ সালের ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এই সিরিজের এগারোটি প্রবন্ধের মধ্যে নটি সংগ্রহ করে এবং 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা থেকে পনেরোটি সম্পাদকীয় সংকলন করে শ্রী হরিদাস মুখার্জী ও শ্রীমতী উমা মুখার্জী একটি বই প্রকাশ করেন। *Sri Auro-*

১৩। পরবর্তীকালে ব্রাত্য বলতে বোঝাত তাদের যারা ব্রতভ্রষ্ট, পতিত, যারা বৈদিক আচার-সংস্কার পালন করে না। কিন্তু অথর্ব বেদে 'ব্রাত্য' নাম দেওয়া হয়েছে একধরনের ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তিদের যারা বেদবহির্ভূত কোন আদিম ধর্মের পুরোহিত। W. D. Whitney, tr. *The Atharva Veda*, Cambridge, Mass, XV.

১৫। 'In a word, Bengale, abounds with every necessary of life......

The rich exuberance of the country, together with the beauty and amiable disposition of the native women, has given rise to a proverb in common use among the Portuguese, English, and Dutch that the kingdom of Bengale has a hundred gates open for entrance, but not one for departure⋯' Francis Bernier, *Travels in the Moghul Empire* (1656-68), tr. A. Constable.

হুয়েন্‌ত্‌সাঙ্‌ এবং তাঁরো পাঁচশো বছর আগে আরিয়ানের লেখা থেকে জানা যায়, ভারতীয়রা দুধ, ফল, শাকসবজী ছাড়াও মাছ, মাংস উপভোগ করতেন; অব্রাহ্মণদের মধ্যে সুরাজাতীয় নানা পানীয়ের প্রচলন ছিল; ছেলেরা দাড়িতে লাল, বেগুনী, সবুজ রঙ মাখতেন; উৎসব অনুষ্ঠানের অন্ত ছিল না।

১৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণ-চরিত্র'। বঙ্কিমকল্পিত কৃষ্ণ তাঁর আদর্শ পুরুষ; কিন্তু বিভিন্ন পুরাণকাহিনীতে, ধর্মশাস্ত্রে, কাব্যে, লৌকিক বিশ্বাসে-অনুষ্ঠানে যে কৃষ্ণের পরিচয় মেলে বঙ্কিমের প্রাজ্ঞ, বিবেকী, যুক্তিশীল, সত্যসন্ধ নায়কের সঙ্গে তার মিলের চাইতে অমিল অনেক বেশি। বঙ্কিমের মতো ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এখানে যে ভাবে নিজের চোখে নিজে ধুলো দিয়েছেন তাতে বাংলায় যুক্তিবাদের চর্চার গলদই ধরা পড়েছে।

১৭। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'বৃহৎতন্ত্রসার' গ্রন্থে গুহ্যকালীর ধ্যানমন্ত্রটি স্মরণীয়। কারো কারো অনুমান কালীর সঙ্গে বৈদিক নিঋতির সম্পর্ক আছে। তা থাক বা নাই থাক 'দেবীমাহাত্ম্য' রচনার কাল থেকেই দুর্গার অন্যতম রূপ হিসেবে কালী সুপ্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী উভয়ের বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও অন্তত বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে কালীর প্রতিপত্তি এই শতকে বেড়েই চলেছে—বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের অনুরাগীরাই শুধু কালীভক্ত নন, আজকাল পাড়ায় পাড়ায় কালীপুজোয় কম্যুনিস্ট এবং কংগ্রেস উভয় দলের দাদারাই মাতব্বরী করে থাকেন। দুই দলের ভিতরে যে ধরনের খুনোখুনি ও বোমাবাজী চলেছে তাতে এঁরা যে সহিংস শাক্ত তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এঁরা তো ভারতীয় ঐতিহ্যের বাহক এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকও বটে।

১৮। কুমারন আসানের দীর্ঘ কবিতাটির নাম 'চিন্তাবিষ্টয়া সীতা'। বাল্মীকি মুনি লব এবং কুশকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় রামের রাজসভায়